স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

হিন্দুত্ববুক্স

https://hindutvabooks.com

https://facebook.com/hindupustakkendra

https://twitter.com/hindutvabooks

mailto:hindutvabooks@gmail.com

ভূমিকা

আমার কোন আত্মীয় একখানি ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতেছেন। তাঁহার অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া আমি ঐ পুস্তক তাঁহার সহযোগে পাঠ করিয়া দেখিতেছি। যে দিন তাঁহার অনুবাদিত তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ পাঠ করি সেই দিন হঠাৎ আমার কণ্ঠতালু বিশুষ্ক হইতে লাগিল, শরীর পুনঃ পুনঃ লোমাঞ্চিত হইল, পুস্তক পাঠ যেন মহা ভার হইয়া পড়িল। পাঠ নিবৃত্ত করিয়া ঐ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ অন্যরূপে পরিসমাপ্ত হইলে কি হইত, এই বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। কিন্তু শরীরের যে ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুস্থ হইবার মানসে শয়ন করিলাম। নিদ্রাবস্থায় যে কত স্বপ্ন দেখিলাম, আনুপূর্ব্বিকক্রমে মনে নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি, কয়েক খণ্ড কাগজ আমার শিরোদেশে রহিয়াছে। তাহার লেখা দেখিয়া কখন বোধ হয় আমার নিজের লেখাই হইবে, কখন বোধ হয়, আমার না হইতেও পারে। ফলতঃ ও বিষয়ে কিছুই স্থির করিয়া বলিবার যো নাই। নিদ্রাবস্থাতেও যে কেহ কেহ কখন জাগ্রতের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাহার অনেক উদাহরণ ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়। আমার ওরূপ হয় না, এ সময়েও হয় নাই। কিন্তু যেমন ঘুমাইয়াও জাগা যায়, তেমনি জেগেও ঘুমান যাইতে পারে। বাহা হউক, শাস্ত্রে বলে—স্বপ্নলব্ধ ঔষধ এবং উপদেশ কদাপি অগ্রাহ্য নহে। শাস্ত্রানুবর্ত্তিকার্য্য করাই উচিত বোধে এই “স্বপ্নলব্ধ ভারত ইতিহাস” এডুকেশন গেজেটে প্রচারিত করিতে দিলাম।[1]

গ্রন্থ প্রচারক।

[1]এডুকেশন গেজেটে ১২৮২ সালের ৬ই কার্ত্তিক হইতে প্রতি সপ্তাহে এক অধ্যায় করিয়া প্রকাশিত হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ : পানিপথের যুদ্ধ

তখন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিলেন যে, জাতিভেদে যেমন অন্যান্য বিষয়ের প্রভেদ হয়, তেমনি যুদ্ধ প্রণালীও ভিন্ন হইয়া থাকে। যে যাহার আপনার অভ্যস্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াই বিজয়ী হইতে পারে, তাহার অন্যথা করিলে পরাজিত হয়। যেমন চকিতের ন্যায় এই ভাব তাঁহার মন মধ্যে উদিত হইল, অমনি তিনি সেনানায়কগণকে সম্মুখ সংগ্রাম হইতে অপসৃত হইয়া শত্রুর পার্শ্ব ভাগ আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার অনুজ্ঞার সমগ্র তাৎপর্য্যই বুঝিল, ক্ষণমাত্রে আপনাদিগের ব্যূহের রূপান্তর করিল, এবং দেখিতে দেখিতে সেই প্রভূত সেনারাশি অর্দ্ধচন্দ্রের আকার হইয়া দাঁড়াইল। আহম্মদ সাহের পরাক্রান্ত অশ্বারোহি-দল সবেগে আসিতেছিল। কাহার সাধ্য যে সেই বেগ সহ্য করে? নদী স্রোতের অভিমুখে কোন্ প্রতিবন্ধক স্থির হইয়া দাঁড়ায়। এক পাষাণময় পর্ব্বত খণ্ড দাঁড়াইতে পারে, আর লঘু বালুকাস্তূপ যদিও স্থির হইয়া না দাঁড়ায়, তথাপি ক্রমে ক্রমে সমুদয় স্রোতোজল শোষণ করিয়া লইতে পারে। মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রথমে মনে করিয়াছিল, অচলের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে, এবং ঐ আক্রমণ বেগ সহ্য করিবে কিন্তু দৈবানুকূলতাবশতঃ তাহারা সে চেষ্টায় বিরত হইল। তাহারা বিশুষ্ক বালুকারাশির প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া প্রবল স্রোতোমুখ হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল, এবং তাহার উভয় পার্শ্ব ঘেরিয়া শোষণ করিতে আরম্ভ করিল। নদীর জল ক্রমে ন্যূন বেগ, ক্রমে হ্রস্ব, অনন্তর সমুদায়ই বালুকা মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

আহাম্মদ সাহ এই ভয়ানক ব্যাপার অবলোকন করিলেন। মনে করিলেন, আর স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন না; সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি আপন সহচর দুরানিদিগকে এবং স্বপক্ষ রোহিলাদিগকে, আর অযোধ্যার সৈন্যগণকে একত্রিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে নবাব সুজাউদ্দৌলার অনুগৃহীত কাশীরাজ নামক একজন হিন্দু রাজা তাঁহার সমীপাগত হইয়া যথাবিধি নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! আমি মহারাষ্ট্রীয়দিগের বন্দী হইয়া এক্ষণে তাহাদিগের দৌত্য কর্ম্মে আপনার নিকট আসিয়াছি। অনুমতি হইলে তাঁহাদিগের বক্তব্য নিবেদন করি।" "বল"।

"সাহেবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরি প্রথমে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়া চোহান বংশাবতংস মহারাজ পৃথ্বীরাও কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। পৃথ্বীরাও অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু পরবর্ষে স্বয়ং বন্দীকৃত হইলে সাহেবুদ্দীন কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে হিন্দুরা মুসলমানদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, এবং মুসলমানেরাও হিন্দুদিগের প্রতি কেমন আচরণ করিয়াছেন, তাহা ঐ বিবরণেই প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া যদিও বরাবর অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তথাপি হিন্দুদিগের জাতীয় প্রকৃতির অন্যথাচরণ হইতে পারে না। হিন্দুরা পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণেও সদয় আচরণ করিতে প্রস্তুত। আপনি নিজ দলবল সহিত নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে গমন করুন। ভারতবর্ষ নিবাসী যদি কোন মুসলমান আপনার সমভিব্যাহারে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাতেও কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। তবে তাদৃশ মুসলমানের পক্ষে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত এ দেশে প্রত্যাগমন নিষিদ্ধ।" দূত এই পর্য্যন্ত বলিয়া স্বল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিল।—

"মহারাষ্ট্র সেনাপতি আরও একটী কথা বলিয়াছেন। এক্ষণে আপনি সসৈন্যে তাঁহার অতিথি। অতএব সিন্ধু পরপারে আপনার নিজ রাজ্যে যাইতে যে কয়েক দিন লাগিবে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিবেন। আপনার ঐ কয়েক দিনের ব্যয় তিনি নিজ কোষ হইতে নির্ব্বাহ করিবার অনুমতি প্রার্থনা

করেন।”

দূত এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইলে আহম্মদ সাহা ক্ষণকাল মৌনভাবে চিন্তা করিয়া পরে কহিলেন, “দূত! তুমি মহারাষ্ট্র সেনাপতিকে গিয়া বল, আমি তাঁহার উদার ব্যবহারে একান্ত মুগ্ধ হইলাম—আর কখন ভারতবর্ষ আক্রমণে উদ্যম করিব না।” এই কথা শুনিয়া দূত অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, “মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমার প্রতি আর একটী কথা বলিবার আদেশ আছে। এদেশীয় যে সকল মুসলমান নবাব, সুবাদার, জমিদার, জায়গীরদার, প্রভৃতি আপনার সমভিব্যাহারী না হইবেন, তাঁহারা অবিলম্বে যে যাহার আপনাপন অধিকার এবং আবাসে প্রতিগমন করুন। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি বলিয়াছেন, ‘ঐ সকল লোকের পূর্ব্বকৃত সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা হইল’।” দূতের এই কথা শেষ হইবামাত্র অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, রোহিলখণ্ডের জায়গীরদার নজিবউদ্দৌলা, হায়দরাবাদের নিজাম সলাবতজঙ্গের সেনাপতি ও ভ্রাতা নিজাম আলি ইহাঁরা পরস্পর মুখাবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন, “সেনাপতি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া স্ব স্ব অধিকারে গমন করিতে হইলে আমাদিগের যৎপরোনাস্তি মনোভঙ্গ হইবে।” দূত সকলের নিকট প্রণত হইয়া বলিল, “তবে আপনারা দিল্লীনগরে গমন করুন, সেই স্থানে সাক্ষাৎ হইবে— আমার প্রতি এইরূপ বলিবারও অনুমতি আছে।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্ত

প্রাচীন দিল্লির মধ্যে যে স্থানের নাম ইন্দ্রাপৎ (ইন্দ্রপ্রস্থ) তাহার অনতিদূরে একটি সভামণ্ডপের মধ্যভাগে পৃথ্বীরাওয়ের আয়সস্তম্ভ নিখাত ছিল। পূর্বে পৃথ্বীরাওয়ের প্রার্থনাক্রমে যজ্ঞবিদ্ ব্রাহ্মণেরা ঐ শুভ স্তম্ভ নিখাত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহা বাসুকীর শিরোদেশ স্পর্শ করিল—ইহার উপর যে সিংহাসন অধিষ্ঠিত হইবে, তাহা চিরকাল অচল থাকিবে। আজি আর সেই স্তম্ভ দৃষ্ট হইতেছে না, ভূমি-মধ্যে আরও বসিয়া গিয়াছে, এবং তদুপরি একট অত্যুচ্চ দিব্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠাপিত রহিয়াছে। সভামণ্ডপের যে অকাল জীর্ণ প্রাচীর ছিল তাহাও আর সেরূপ নাই, সমস্ত নবীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের যাবতীয় রাজা, নবাব, সুবাদার প্রভৃতি সকলে ঐ সভামণ্ডপে আপনাপন যোগ্যস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। সভার কি শোভা! রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের ময়দানববিনির্ম্মিত সভাগৃহ ইন্দ্রের সভা অপেক্ষাও উজ্জ্বল এবং মনোহর বলিয়া বর্ণিত। এই স্থানেই সেই সভাগৃহ ছিল—তাহাই কি এতদিন কাল তরঙ্গে মগ্ন থাকিয়া পুনর্ব্বার ভাসিয়া উঠিয়াছে! সভামণ্ডপের মধ্য ভাগে যে সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে, তাহার দুই দিকে দুইটী সোপান-শ্রেণী। সর্ব্ব নিম্ন-সোপানে এক জন গম্ভীর প্রকৃতি মধ্য-বয়স্ক পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন—

“আমাদিগের এই জন্মভূমি চিরকাল অন্তর্বিবাদানলে দগ্ধ হইয়া আসিতেছিল, আজি সেই বিবাদানল নির্ব্বাপিত হইবে। আজি ভারতভূমির মাতৃ-ভক্তি-পরায়ণ পুত্রেরা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে শান্তিজলে অভিষিক্ত করিবেন।

“ভারতভূমি যদিও হিন্দুজাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইহাঁর পর নহেন, ইনি উহাঁদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া অসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইহাঁর পালিত সন্তান।

“এক মাতারই একটী গর্ভজাত ও অপরটী স্তন্যপালিত দুইটী সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয়—সকলের শাস্ত্র মতেই হয়। অতএব ভারতবর্ষ নিবাসী হিন্দু এবং মুসলমান দিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ জন্মিয়াছে। বিবাদ করিলে সেই সম্বন্ধের উচ্ছেদ করা হয়। আর আমাদিগের মধ্যে কি পূর্ব্বের মত বিবাদ চলিবে? আমরা কি চিরকালই জ্ঞাতিবিরোধে আপনাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত এবং অপরের উদরপূরণ করিব? (এই পর্য্যন্ত বলা হইলেই সভ্য হইতে “না না”—“না না” “না না”—এই ধ্বনি উঠিল) কি অমৃতধারাই আমার কর্ণে বর্ষণ হইল—! আমার কর্ণে?—আমি কে?— ভারতভূমির কর্ণে—ঐ মৃত্যু সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রবেশ করিল। দেখ—তাঁহার চক্ষু উন্মিলিত হইল—মুখমণ্ডলে হাস্যপ্রভা দেখা দিল—তিনি মৃত্যুশয্যা হইতে উঠিলেন—এবং পূর্ব্বের ন্যায় প্রভাময়ী হইলেন।

“এক্ষণে সকলকে সম্মিলিত হইয়া মাতৃদেবীর সেবার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সকলের কর্ত্তা এক জন না থাকিলেও সম্মিলন হয় না। কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের সকলের অধিনায়ক হইবেন। দৈবানুকূলতায় এ বিষয়েও আর বিচার করিবার স্থল নাই। রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের নিমিত্ত এই যে সিংহাসন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার ভিত্তিমূল পৃথিবী ভেদ করিয়া বাসুকির শীর্ষদেশ সংলগ্ন হইয়াছে, পৃথিবী টলিলেও আর ইহা টলিবে না—আর ঐ দেখ, মহামতি সাহ আলম বাদসাহ স্বেচ্ছাতঃ রাজা রামচন্দ্রকে আপন শিরোভূষণ-মুকুট প্রদান করিয়া তাঁহার হস্তে সাম্রাজ্য পালনের ভার সমর্পণ করিবার নিমিত্ত আসিতেছেন।”

সভামণ্ডপের দক্ষিণ এবং উত্তর প্রান্তবর্ত্তী দুইটী প্রশস্ত পটমণ্ডপ হইতে একেবারে দুইটী ভেরীরব বিশ্রুত হইল—দক্ষিণদিক্ হইতে একজন গৌরকান্তি, দীর্ঘচ্ছন্দ, ম্লানবদন মধ্য বয়স্ক পুরুষ সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎ সত্বর-পদে সিংহাসন সমীপে উপনীত হইলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত বক্তার হস্তাবলম্বন পূর্ব্বক এক এক পা করিয়া সিংহাসনের সর্ব্বোচ্চ ভাগে উঠিতে লাগিলেন। তিনি যে সময়ে উঠিতেছিলেন, তৎকালে উত্তর দিকস্থ পটমণ্ডপ হইতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মধ্যচ্ছন্দ এক জন কৃশাঙ্গ যুবা পুরুষ সুগভীর চিন্তাবনত মুখে শনৈঃ শনৈঃ পাদচারে সিংহাসনাভিমুখে আসিয়া বিনা সাহায্যে তাহার সোপান অতিক্রমপূর্ব্বক সর্ব্বোচ্চ ভাগে উপস্থিত হইলে, দুই জনেই একেবারে সিংহাসনের উপর পরস্পর সম্মুখীন! গৌরাঙ্গ পুরুষ তৎক্ষণাৎ আপনার শিরস্ত্রাণ হইতে মহামূল্য হীরক-মণ্ডিত সুবর্ণময় মুকুট খুলিয়া অপরের মস্তকোপরি বসাইয়া দিলেন, এবং তাহা করিয়াই পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া সিংহাসনের একটী সোপান নিম্নে আসিবার উপক্রম করিলেন। যুবা উভয় হস্তদ্বারা তাঁহার উভয় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করত তাঁহাকে নামিতে দিলেন না।

সভা মধ্যে কি হিন্দু কি মুসলমান দ্রষ্টৃমাত্রেরই চক্ষু বাষ্পাকুলিত হইল—সকলেরই কণ্ঠ হইতে গদগদ স্বরে "সম্রাট রাজা রাম চন্দ্রের জয়—সাহা আলম বাদসাহের জয়" এই বাক্য নিঃসৃত হইল। সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রণত হইয়া পড়িল।

নিমেষ মধ্যে সকলের প্রতি গাত্রোত্থানের আজ্ঞা হইল। উঠিয়া আর কেহই সাহ আলমকে দেখিতে পাইলেন না। দিল্লীর সিংহাসনোপরি শিবজী বংশ সম্ভূত রাজা রামচন্দ্র একাকী—উপবিষ্ট তাঁহার শিরোদেশে সাহ আলম প্রদত্ত সেই রাজমুকুট!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মূল ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থাপক সভা

সাজাহান বিনির্ম্মিত নব দিল্লীর মধ্য ভাগে জুমা মসজিদ। জুমা মসজিদের ঊর্দ্ধ হইতে দেখিলে দিল্লী নগর যেরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। বোধহয় যে ঐ মসজিদটীই নগরের নাভি স্থল। তাহা হইতে কিরণ জালের ন্যায় চতুর্দ্দিকে রাজবর্ত্ম সকল বাহির হইয়া গিয়াছে, এবং প্রতি রাজবর্ত্ম হইতে পরস্পর সমদূরে অন্যান্য পথ নিঃসৃত হইয়াছে। সমুদায়টী যেন একটী লূতাতন্তুজাল। ঐ জাল মধ্যভাগে জুমা মস্‌জিদ এবং প্রতিতন্তুর পার্শ্বদেশে প্রজাবর্গের আবাস গৃহ।

দিল্লীর রাজবর্ত্ম সকল জনতায় পরিপূর্ণ। জুমা মস্‌জিদে মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইয়াছে। এই সভায় অভিনব সাম্রাজ্যের সংরক্ষণ পালনাদির ব্যবস্থা নিরূপিত হইবে। প্রজাদিগের কৌতূহলের পরিসীমা নাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, জাঠ, মহারাষ্ট্র, মুসলমান প্রভৃতি নানা প্রদেশ বাসী জনগণ পথিপার্শ্বে স্থানে স্থানে মিলিত হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিতেছে। সকলেরই মুখ প্রফুল্ল, অন্তঃকরণ উৎসাহ পূর্ণ। একজন ব্রাহ্মণ একজন মুসলমানকে বলিতেছেন "যে রাম সেই রহীম, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়"। মুসলমান বলিতেছেন "ঠাকুর যথার্থ কহিয়াছেন, সমস্ত জগৎ সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই বিভূতি মাত্র, মানুষ ভেদে যেমন আচারভেদ—পরিচ্ছদ ভেদ—ভাষাভেদ—তেমনি উপাসনার প্রণালীভেদও হইয়া থাকে। সকলেই এক পিতার পুত্র। সেই পিতা ভিন্ন ভিন্ন পুত্রকে ভিন্ন ভিন্ন পোষাক পরাইয়া দেখিতেছেন। কিন্তু সকলেরই চামড়ার নীচে লহু লাল বই কাহারোও কাল কাহারোও জরদ নহে।" একজন ক্ষত্রিয় ঐ কথায় যোগ দিয়া বলিল "তাবই কি—আসলে কিছুই তফাৎ নাই—আমরা হিন্দু বলিয়া কি মুসলমানের দেবতা মানি না? আমরাও প্রতিবর্ষেই তাজিয়া করিয়া থাকি"। একজন বাঙ্গালী কহিল—"আমাদিগের দেশে সকল কর্ম্মেই সত্যপীরকে সিন্নি দেওয়া হইয়া থাকে, যিনি সত্যপীর তিনিই সত্য নারায়ণ।" আর একজন মুসলমান বলিল, "তোমরাই যে আমাদের দেবতা মান, আমরা তোমাদের দেবতা মানি না, একথা বলিতে পারিবেনা। কোন্ মুসলমান হিন্দু দেবতার এবং ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের যথোচিত সম্মাননা না করে? আমার জানত অনেক মুসলমান ব্রাহ্মণদিগকে খরচ পত্র দিয়া দুর্গোৎসব করান। দরাপ খাঁ "সুরধুণি মুনি কন্যে" বলিয়া কেমন ভক্তি সহকারে গঙ্গাদেবীর স্তব করিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহার অজানত আছে?" নগরময় এইরূপ কথোপকথন, কোথাও হাস্য পরিহাস, কোথাও গান বাজনা, কোথাও প্রীতিভোজের সমারোহ।

জুমা মস্‌জিদের মধ্যে ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি একত্র সমাগত। উত্তর দিকে মহারাষ্ট্র মন্ত্রিবর বালাজী বাজীরাও পেশোয়া, তাঁহার দক্ষিণে কিঞ্চিৎদূরে মলহর রাও হুলকার, তাঁহার দক্ষিণে মাদাজী সিন্ধিয়া, তাঁহার দক্ষিণে দম্মাজি গুইকবার, তৎপার্শ্বে জানোজী ভোঁসলা, তাঁহার পার্শ্বভাগে সদাশিব রাও। পেশোয়ার বামপার্শ্বে কিঞ্চিৎদূরে সলাবত জঙ্গ, তৎপার্শ্বে সুজাউদ্দৌলা তাঁহার পার্শ্বে নজিব উদ্দৌলা, তাঁহার পার্শ্বে সুর্য্যমল; পেশোয়ার সম্মুখভাগে উদয়পুর যোধপুর আজমীর জয়পুর প্রভৃতি প্রদেশের ক্ষত্রিয়রাণা সমস্ত এবং তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে তজ্জাতীয় বীরাবয়ব ঠাকুর দল।

পেশোয়া কহিতেছেন "অদ্য আপনারা চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিলেন। শত শত সহস্র সহস্র বর্ষ পরে যাঁহারা এই ভারত ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাও আপনাদিগের যশঃ কীর্ত্তন করিবেন।

সকলের অভিমতানুসারে রাজ্য স্থাপনের এই কয়েকটী মূল নিয়ম অবধারিত হইয়া সুবর্ণ ফলকে লিখিত হইল, সুবর্ণ যেমন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধাতু, কখন কলঙ্কিত বা পরিবর্ত্তিত হয় না, এ নিয়ম গুলিও সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয়।

১ম। সাক্ষাৎ শিবাবতার মহারাজ শিবজীর বংশ সম্ভূত রাজা রামচন্দ্র, বৈদেশিক শত্রু পরাভূত করিয়া নিজ বংশমর্য্যাদা ও বীরতাগুণে প্রদেশাধিকারী, ভূম্যধিকারী এবং প্রজা সাধারণের ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা ভাজন হওয়ায় ভারতবর্ষের প্রথম সম্রাট হইলেন।

২য়। তাঁহার বংশে ঔরসাদি জ্যেষ্ঠ পুত্রে চির কালের নিমিত্ত সম্রাজ্যাধিকার ন্যস্ত থাকিবে।

৩য়। সম্রাট আপনার মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করিবেন, এবং সেই সভার দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

সাম্রাজ্যের রক্ষার হেতু কয়েকটী ব্যবস্থা স্থির হইয়া রৌপ্য ফলকে লিখিত হইল। এ নিয়মগুলি সৌবর্ণ নিয়মাবলীর ন্যায় অপরিবর্ত্তনীয় নহে—কিন্তু সম্রাট ভিন্ন অপর কেহ ইহাদিগের পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করতেও পারেন না। নিয়মগুলি এই—

১মতঃ। শিখ এবং মহারাষ্ট্রীয় মিলিত একটী সৈন্য দল সিন্ধু নদের উপকূলে শিবির সন্নিবেশ করিয়া থাকিবে। ঐ সৈন্যের ব্যয় সাম্রাজ্যের রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে। উহার অধিনায়ক বর্গের নিয়োগও সম্রাটের সাক্ষাৎ অধীন থাকিবে।

২য়তঃ। সমুদ্রোপকূলভাগে যে যে স্থানে বিদেশীয় লোক বানিজ্য করিবার নিমিত্ত আসিয়া আছে, সেই সেই স্থানেও সমাটের সাক্ষাৎ অধীন ঐরূপ এক একটী সৈন্য দল থাকিবে।

৩য়তঃ। কোন রাজা বা নবাব অথবা সুবাদার আপনার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যের অধিক বা অল্প সৈন্য রাখিতে পরিবেন না।

৪র্থতঃ। তাঁহারা স্বয়ং কোন প্রকার সন্ধি বিগ্রহ কার্য্যে লিপ্ত হইতে পরিবেন না। যদি কোন কারণে পরস্পর মনোবাদ উপস্থিত হয়, সম্রাটের নিকট অভিযোগ করিয়া তৎকৃত মীমাংসা গ্রহণ করিবেন।

৫মতঃ। সম্রাট অনুজ্ঞা করিলেই সকলে সসৈন্যে আসিয়া তাঁহার সহায়তা করিবেন।

৬ষ্ঠতঃ। প্রতি প্রদেশাধিকারীর প্রধানতম দুর্গ মধ্যে সম্রাটের খাস কতক সেনা অবস্থাপিত হইবে।

রাজস্ব সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত স্থির হইয়া যাহা তাম্র ফলকে লিখিত হইল, তাহা পরিবর্ত্তনীয় এবং তাহার পরিবর্ত্ত করিবার প্রস্তাব সম্রাটের মন্ত্রিদল অথবা প্রদেশাধিকারী কিম্বা ভূম্যধিকারী সকলেই করিতে পারেন। নিয়মগুলি এই—

১মতঃ। প্রতি গ্রামের ভূমি কত, এবং তাহার উৎপন্ন কত, তাহা অবধারিত করিতে হইবে; অনন্তর ঐ উপস্বত্বের ষষ্ঠাংশ রাজকোষে প্রেরিত হইবে। যাহা থাকিবে, তাহার দ্বিষড় ভাগ ভূম্যধিকারী এবং প্রদেশাধিকারী উভয়ে সমান পরিমাণে ভাগ করিয়া লইবেন। অবশিষ্ট সমুদায় গ্রামিকদিগেরই থাকিবে। ভূমির উৎপন্ন বিভাগ সম্বন্ধে যে নিয়ম, অপর সর্ব্বপ্রকার রাজস্বের সম্বন্ধেও সেই নিয়ম চলিবে।

শান্তি রক্ষার ভার গ্রামবাসীদিগের প্রতি অর্পিত থাকিবে। তবে ভূম্যধিকারী এবং প্রদেশাধিকারীরা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

ধর্ম্মাধিকরণের ভারও গ্রামবাসীদিগের প্রতি অর্পিত থাকিবে। তবে ভূম্যধিকারী এবং প্রদেশাধিকারীরা তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন। ফলতঃ প্রতি গ্রাম যেন একটী স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্য হইয়া থাকিবে। ভূম্যধিকারিগণ এবং প্রদেশাধিকারিগণ সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের আভ্যন্তরিক শাসনের প্রতি হস্তার্পণ করিতে যথাসাধ্য বিরত থাকিবেন—গ্রাম গুলিকে আপনাপন শান্তিরক্ষা ও ধর্ম্মাধিকরণ এবং রাজস্ব প্রদান সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা করিতে দিবেন। ভারত ভূমির চিরপ্রচলিত ব্যবহার এই এবং এই ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত এবং যুক্তি সঙ্গত।

নগরের শাসন-প্রণালীও ঐ রীতির অনুসারে নির্ব্বাহিত হইবে। প্রতি নগর কয়েকটী পল্লীতে বিভক্ত হইবে এবং যেমন গ্রামে গ্রামে মুখ্য মণ্ডলাদি থাকিবে পল্লীতেও সেইরূপ মুখ্য মণ্ডল নিযুক্ত হইবে।

ভারত সাম্রাজ্য পালনের নিমিত্ত এই কয়েকটী স্থূল স্থূল ব্যবস্থা এক্ষণে নিরূপিত হইল। পরে এই সকল মূল নিয়ম রক্ষা করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবধারিত হইবে। তাহা করিবার নিমিত্ত অদ্য এই সূত্রপাত করা যাইতেছে—ভারতবর্ষের অষ্টাদশ প্রদেশাগত অষ্টাদশ জন সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ মহাপুরুষ এবং সম্রাটের মন্ত্রিবর্গ ইহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া ভারত সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপক মহাসভার সদস্য হইবেন। এই সভার দ্বারা রাজ্য সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান সর্ব্ব বিষয়ের বিচার হইবে। সাম্রাজ্যের মধ্যে যাহার যে কোন নিয়ম প্রচলিত করিবার ইচ্ছা হইবে, এই সভায় তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়া বিচারিত হইবে। এই সভা হইতে ব্যবস্থাপিত এবং প্রচারিত হইয়া না গেলে কোন ব্যবস্থাই লোকের গ্রাহ্য হইবে না। যেমন ভগবানের বিরাট মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপক তেমনি সম্রাটের শরীরও ভারতবর্ষব্যাপক। কৃষ্যুপজীবী এবং শিল্পব্যবসায়ী শ্রমশীল প্রজাব্যূহ সেই শরীরের নিম্নভাগ, বণিক সম্প্রদায় এবং ধনশালী ব্যক্তিগণ তাহার মধ্যদেশ, যোদ্ধৃগণ এবং রাজকর্ম্মচারিগণ তাহার হস্ত—পণ্ডিত মণ্ডলী তাহার শিরোদেশ—এই সভা তাহার মুখ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উন্নতির পথ মোচন

আগরা নগরের ক্রোশৈক মাত্র পশ্চিমে আকবর সাহের সমাধি মন্দির—উহার নাম সেকন্দ্রা। সকলেই তাজমহলের শোভা অনুভব করিয়াছেন—এবং ঐ নির্ম্মাণ কীর্ত্তি যে পৃথিবী মধ্যে অতুল্য, তাহাও বলিয়া থাকেন। কিন্তু অনুমান হয়, নিজ চিত্তবৃত্তি পর্য্যালোচনে সক্ষম এমত প্রকৃতদর্শী পর্য্যাটকের চক্ষে তাজমহলের শোভা অপেক্ষা সেকন্দ্রার শোভা অধিক। তাজ মহলের অভ্যন্তরে গমন করিলে বোধ হয় যেন আকাশ-মণ্ডলের অনুরূপ-রূপ সংঘটন করিবার উদ্দেশেই নির্ম্মাতা উহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেকন্দ্রার প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে ক্রমশঃ গমন করিতে করিতে গমনকারীর বোধ হইয়া যায় যেন তিনি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া আকাশমার্গে উত্থাপিত হইতেছেন। নির্ম্মাতা তাঁহাকে মর্ত্তভূমি হইতে স্বর্গারূঢ় করিবার সোপান-শ্রেণী বিন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। মহাত্মা আকবরের সমাধি-বিবরের উপরিভাগের প্রস্তরখণ্ডটী ফাটিয়া রহিয়াছে। লোকে বলে, বিদ্যুৎপাতে ঐরূপ হইয়াছে, তাহাই কি? না, ঐ মহাপুরুষের প্রভাময় আত্মা আবরণ প্রস্তরকে উদ্ভিন্ন করিয়া সমীপবর্ত্তিনী দিব্যভূমিতে বিচরণ করিতে গমন করিয়াছে? সেকন্দ্রার চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য। হাতি, ঘোড়া, উট্, তামজান, রথ অসংখ্য। সম্রাট্ রামচন্দ্র সেকন্দ্রা দর্শনে আসিয়াছেন, এবং প্রধান মন্ত্রী পেশোয়াকে সমভিব্যাহারে করিয়া যে সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে আকবরের সমাধি স্থান, সেই স্থানে গমন করিয়াছেন। দুই জনে তথায় উপবিষ্ট, রাজা রামচন্দ্র কহিতেছেন—“পিতঃ, আমি আপনার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া এই স্থানে আসিয়াছি— তাজমহল অপেক্ষাও এই স্থানটী অধিকতর রমণীয় বলিয়া আমার বোধ হয়।” বাজীরাও কহিতেছেন, “বৎস! তাজমহল একজন সমৃদ্ধিশালী বাদসাহের নির্ম্মিত বটে, কিন্তু যিনি সেকন্দ্রার নির্ম্মাতা, তিনি কেবল ধনশালী বাদসাহ ছিলেন না, তিনি এক জন সুদূরদর্শী মহাপুরুষ ছিলেন। আকবর সাহাই বুঝিয়াছিলেন, কেমন করিয়া অন্তর্ব্বিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন মহাদেশটীকে একচ্ছত্র করিয়া রাখিতে হয়। ধর্ম্মবিদ্বেষ কখনই তাঁহার অন্তঃকরণে স্থান লাভ করে নাই। তিনি হিন্দু এবং মুসলমানকে একধর্ম্মসূত্রে সম্বদ্ধ করিবার জন্য কি বিচিত্র উপায়েরই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যিনি ঐ পথে না চলিবেন তিনিই ভারতবর্ষের সিংহাসন হইতে স্খলিতপদ হইবেন।” রামচন্দ্র কহিলেন, “মুসলমান সম্রাটেরা পরধর্ম্মবিদ্বেষী হইতে পারেন, হিন্দুসম্রাটেরা কখনই সেরূপ হইতে পারেন না।” বাজীরাও বলিলেন, “সে কথা সত্য। হিন্দুরা স্বধর্ম্মে ভক্তি করেন, অথচ পরধর্ম্মে বিদ্বেষ করেন না। কিন্তু যেমন পরধর্ম্ম-বিদ্বেষ নাই, তেমন আমাদিগের আর একটী দোষ আছে। আমরা আবহমানকাল সকল বিষয়ে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া আসিতেছি, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা করিতে চাহি না। কিন্তু সকল সময়ে কি এক নিয়ম চলে? আমি সম্প্রতি বঙ্গদেশে গিয়া যাহা যাহা দেখিয়া আসিলাম, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। শুনিলেই বোধ হইবে যে, আমাদিগকে পূর্ব্বরীতির কিছু কিছু ব্যত্যয় করিতে হইবে—তাহা না করিলে ভবিষ্যতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।”—বাজীরাও কহিতে লাগিলেন, “বাঙ্গালার সুবাদার তাঁহার অধিকারস্থ কতকগুলি বিদেশীয় লোকের একটী নগর লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে নানা প্রকারে যন্ত্রণা দিয়াছিলেন। ঐ বিদেশীয়েরা এক প্রকার ফিরিঙ্গী। তাহাদিগেরও বর্ণ সাদা ও চক্ষু কেশ লোম কটা। তাহারাও বিলক্ষণ সাহসী এবং সবল। ফিরিঙ্গীরা যে সবল এবং সাহসী, তাহা বলিবার অপেক্ষা কি? তাহা না হইলে কি মহা সমুদ্র পার হইয়া এই দূরদেশে আইসে? ঐ ফিরিঙ্গীদিগের নাম ইংরাজ। তাহারা যে নগরটিতে থাকে, তাহার নাম আলীনগর। শতাধিক বর্ষের মধ্যে তাহারা ঐ নগরটীকে বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছে। ঐ নগরে অন্যূন ৭০ সহস্র লোকের বাস, এবং শুনিলাম উহার রাজস্ব বার্ষিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকারও অধিক। অতএব ইংরাজেরা শুদ্ধ সামান্য বণিক নহে, তাহারা রাজনীতিও বুঝে। যাহা হউক, বাঙ্গালার নবাব কলিকাতা লুঠ করিলে ইংরাজেরা যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হয়,

এবং মাদ্রাজে তাহাদিগের যে অপর একটি আড্ডা আছে, তথা হইতে ৫।৬ খানি জাহাজে চড়িয়া তাহাদের অনেক লোক বাঙ্গালায় আসিয়া পৌছেন। আলীনগর ত তাহারা আসিবামাত্রই পুনরধিকার করে; অনন্তর কিছুদিনের মধ্যে সুবেদারকেও সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহারই সেনাপতিকে তাঁহার গদিতে বসায়। ঐ সেনাপতি সুবেদার হইয়া তাহাদিগকে অনেক ধন এবং কতক ভূমি জায়গীর দেয়। রাজ্যপালনে সক্ষম, সুহৃদ্‌ভেদে সমর্থ, নিতান্ত সাহসিক এবং অধ্যবসায়শালী ইংরাজ জাতি এইরূপে লব্ধ প্রবেশ হইতেছিল। আমি তাহাদিগের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলাম। কিন্তু ইংরাজ দিগের পূর্ব্ব অধিকার যাহা যাহা ছিল—তাহা সমুদায় তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলাম। উহাদিগের কর্ত্তার নাম ক্লাইব। সে ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা এবং তেজস্বিতা অসাধারণ। তাহার কোন মতেই ইচ্ছা ছিল না যে, জায়গীর পরিত্যাগ করে। কলিকাতার দুর্গটীও পুনর্নির্ম্মাণ করিতে তাহার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু তাহারও সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিতে দিতে পারিলাম না। আমাদিগের সৈন্যে তাহাদিগের বাণিজ্য কুঠীর রক্ষা করিবে, অতএব দুর্গ নির্ম্মাণে তাহাদের প্রয়োজন নাই —আর তাহারা বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে, বাণিজ্য করুক, এদেশে ভূমি সম্পত্তি লওয়া তাহদের অনাবশ্যক, এই সকল যুক্তি প্রদর্শনে তাহাকে নিরস্ত করি। কিন্তু তাহার আকার ইঙ্গিতে বিলক্ষণ বোধ হইয়াছিল যে যদি সাম্রাজ্যের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় বিশৃঙ্খল থাকিত, এবং আমার সহিত এত অধিক সুশিক্ষিত সৈন্য না থাকিত, তবে সে কখনই ঐ সকল যুক্তি গ্রহণ করিত না। সে একটী বাঘের বাচ্চা। কিন্তু যখন দেখিল যে, কোন ক্রমেই আমার অভিমতির অন্যথা হইল না—তখন তর্জ্জন গর্জ্জন ছাড়িয়া দিল, এবং আমার সহিত সৌহার্দ্দ বন্ধনে প্রবৃত্ত হইল। এক দিন আমাকে তাহার সিপাহীদিগের কাওয়াজ দেখাইল—এক দিন তাহার যুদ্ধপোতে লইয়া গেল। ঐ সমস্ত দেখিয়া আমার এই বোধ হইয়াছে যে, ফিরিঙ্গীরা আমাদিগের অপেক্ষা যুদ্ধ কৌশল এবং রণপোত নির্ম্মাণের প্রণালী উত্তমরূপে বুঝে। অতএব আমি মনে করিয়াছি কতকগুলি ফিরিঙ্গীকে নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের দ্বারা এ দেশীয় দিগকে যুদ্ধ কৌশলের এবং পোত প্রস্তুত করিবার রীতি শিখাইয়া লইব। তদ্বিষয়ে এই এক সুবিধা আছে, ফিরিঙ্গীরা নিতান্ত অর্থগৃধ্নু। উহাদিগকে মোটা মোটা মাহিয়ানা দিলে উহারা আমাদিগের নিকট চাকুরি করিবে।

ক্লাইবের নিকট আমি আর একটী দ্রব্য দেখিতে পাইয়াছিলাম। তাহার রণ পোতে তথায় এক খানি বৃহৎ পুস্তক দেখিয়া উহা কি জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে উহাতে নানা দেশের চিত্র আছে, এবং সেই চিত্র খুলিয়া তাহাদিগের নিজের দেশ কোথায়, এবং অন্যান্য ফিরিঙ্গীদিগের দেশ কোথায়, তাহারা কে কোন পথ দিয়া কেমন করিয়া এখানে আইসে, সমুদয় দেখিয়াছিল। পরিশেষে ঐ চিত্রময় পুস্তক আমাকে উপঢৌকন দিয়াছে। চিত্রগুলি যে সত্য, তাহা অপরাপর ফিরিঙ্গী এবং নাখোদা প্রভৃতি দেশীয় সওদাগরদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি। এক্ষণে আমার অভিপ্রায় এই যে, ফিরিঙ্গী কারিগর দিগের দ্বারা কয়েক খানি সমুদ্র গমনোপযোগী পোত প্রস্তুত হইলেই তদ্দ্বারা এদেশীয় কতকগুলি সদ্বংশজাত বুদ্ধি বিদ্যা সম্পন্ন যুবা পুরুষকে ফিরিঙ্গীদিগের ভিন্ন ভিন্ন দেশে পাঠাইয়া দিব। তাহারা সেই সকল দেশের ভাষাভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ফিরিঙ্গীদিগের যাবতীয় বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিবে। তাহাদিগের দ্বারা সাম্রাজ্যের যথেষ্ট উপকার দর্শিবে। এমত কার্য্যে সমুদ্র গমনের এবং ম্লেচ্ছ সংসর্গের দোষ জন্মিতে পারে না। ভগবান বশিষ্ঠ ঋষি যখন মহাচীনে গমন করিয়া ছিলেন—তখন স্বয়ং চীনাচার পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন—তাহাতে তিনি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েন নাই।

আমরা যদি কোথাও না যাই, বিদেশ দর্শন না করি —চির কাল এই নিজ গৃহের মধ্যে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকি—তবে আমাদিগের প্রকৃতি স্ত্রীলোকের প্রকৃতির ন্যায় হইয়া যাইবে। আমরা স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া কিছুই করিতে পারিব না, এবং যেমন স্ত্রীলোক পুরুষের বশীভূত হয়, এ দেশীয়রাও সেইরূপ ফিরিঙ্গীর বশ হইয়া পড়িবেন—অতএব এই তিনটী ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিবার অভিলাষ করিয়াছি (১) অন্যূন ২ শত কৃত কর্ম্মা ফিরিঙ্গীকে বেতন দিয়া সৈনিক শিক্ষায় নিযুক্ত করিতে হইবে। ২য়তঃ অপর এক শতকে রণপোত নির্ম্মাণে নিযুক্ত করিতে হইবে। ৩য়তঃ, অন্যূন তিন শত এদেশীয় যুবককে রাজ কোষ হইতে বৃত্তি প্রদান করিয়া ফিরিঙ্গীদিগের দেশে তাহাদিগের ভাষা এবং বিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিতে হইবে।”

সম্রাট্ বিশেষ মনঃ সংযোগ পূর্ব্বক সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন-পিতঃ আপনি যাহা অভিমত করিয়াছেন, তাহাতে অবশ্যই মঙ্গল হইবে। তাহা পরবর্ত্তী কয়েক পরিচ্ছেদে বিবৃত হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বৈদেশিক রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ

লাহোর নগর হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণাভিমুখে অনুমান দেড় ক্রোশ পথ আসিলেই একটী অতি অপূর্ব্ব স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। ঐ স্থানটীর নামক "শালেমার বাগ" উহা সাজাহান বাদসার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। উহার নির্ম্মাণ-প্রণালী এই—সম্মুখে একটী প্রশস্ত উদ্যান, নানা জাতীয় বৃক্ষে পরিপূর্ণ—তাহার অভ্যন্তরে কিয়দ্দূর প্রবেশ করিলেই একটী সোপান-শ্রেণী দৃষ্ট হয়—ঐ সোপানদ্বারা উঠিলে আর একটী প্রশস্ত উদ্যান মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া যায়, তাহারও প্রান্ত-সীমায় আবার একটী সোপান-শ্রেণী আবার একটী উদ্যান। এইরূপ ক্রমে ক্রমে এবং উপর্য্যুপরি অনেকগুলি বৃক্ষবাটিকা অতিক্রান্ত হইলে সুরম্য রাজভবন এবং স্নানাগার শ্রেণী দৃষ্ট হয়। যাঁহারা সুবিখ্যাত রাণী সেমিরেমিস বিনির্ম্মিত বেবিলন নগরের নিরলম্ব উদ্যানের বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, "শালেমার বাগ" দর্শন করিলে তাঁহাদিগের সেই কথা মনে পড়িতে পারে।

সম্রাট্ এবং প্রধান মন্ত্রী সর্ব্বদাই ঐ স্থানে যাইতেন। বৈদেশিক রাজপ্রতিভূদিগের দরবার প্রায় ঐ স্থানেই নির্ব্বাহিত হইত। কোন বর্ষের ফাল্গুন মাসে অতি সমারোহ পূর্ব্বক ঐ স্থানে দরবার হইয়াছিল। ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, রুসিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকা, তুরস্ক, পারস্য, চীন, ব্রহ্ম প্রভৃতি নানা দেশীয় প্রতিভূগণ সমাগত। ফ্রান্স প্রতিভূর ইচ্ছা, তাঁহার দেশে যে প্রজাতন্ত্র-শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ভারত-সম্রাট্ তাহার অনুমোদন করেন, এবং তাহা করিয়া রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া ইংলণ্ডের বিরূপতা নিবারণ করেন। মাসাবধি ঐ বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ এবং তর্ক বিতর্ক হইয়া আসিতেছে। পরে সম্রাটের অভিমতি প্রকাশের নিমিত্ত, ঐ দিন সভা হইয়াছে, এবং পেশোয়া প্রতিভূবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন— "দেশভেদে মনুষ্যের আচারভেদ, ব্যবহারভেদ, ধর্ম্মভেদ এবং শাসন প্রণালীর ভেদ হইবে। যাহারা নিতান্ত অবিবেচক এবং অপ্রকৃতদর্শী তাহারাই সকলকে একরূপ করিতে চায়। সকলেই কখন একরূপ হইতে পারে না। একরূপ হইলেও ভাল হয় না, ভাল দেখায়ও না। এই যে বিচিত্র পুষ্পোদ্যানটী সম্মুখে দেখিতেছি, ইহাতে নানা জাতীয় ফল ফলিয়াছে—ঐ বিভিন্নতাটী না থাকিলে—সকল পুষ্পই একরূপ হইলে কি এত সুন্দর দেখাইত? ভিন্ন ভিন্নরূপ ফল যত প্রকার উপকারে আইসে, একরূপ হইলে কি তত উপকারে আসিত; অতএব ফ্রান্সের শাসন-প্রণালী যদি প্রজাতন্ত্র করাই সেখানকার লোকের অভিমত হইয়া থাকে, তাহার প্রতি ব্যাঘাত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। ফ্রান্স একটী স্বতন্ত্র বৃক্ষ—উহাতেও যে ফুল ফুটিতে হয় ফুটুক, যে ফল ফলিতে হয় ফলুক, রুসীয় অষ্ট্রীয় ইংলণ্ডীয় সম্রাটেরা আমাদিগের সহিত এক মত হইয়া ফ্রান্সের প্রতি হস্তক্ষেপ করায় নিবৃত্ত হউন।

তবে একটী কথা এই, ফ্রান্সবাসীর সুদ্ধ নিজ দেশের শাসন প্রণালী পরিবর্ত্ত করিতে চাহিতেছেন না। তাঁহারা পর রাজ্যে লোক প্রেরণ করিয়া তত্রত্য প্রজাবর্গকে বিদ্রোহ ব্যাপারে প্রোৎসাহিত করিতেছেন। এ কার্য্যটী ভাল নয়। আমরাও যেজন্য ফ্রান্সের শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না, ফরাসীরাও সেই কারণে আমাদিগের রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহবীজ বপন করিবেন না। অতএব আমাদিগের অভিপ্রায় এই, কোন ফরাসী যদি আমাদিগের কাহারও অধিকার মধ্যে আসিয়া বিদ্রোহবীজ বপন করিতেছে—এমত প্রমাণ হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে। আর একটী কথা আছে, ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত রাজ্য-তন্ত্র-তার পক্ষে ভয়াবহ বলিয়া কাহার কাহার বোধ হইতে পারে। যাঁহাদিগের সেরূপ

ভয় হইবে তাঁহারা এক কর্ম্ম করুন, সাবধান হইয়া সত্বরে আপনাপন প্রজা পালনের সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিয়া লউন—আর কোন ভয়ই থাকিবে না। আর একটী কথা আছে, কেহ কেহ ভয় করিতেছেন, ফরাসী গ্রন্থকারেরা যে সকল নাস্তিক্যবাদে ও রাজবিদ্রোহ কথায় পরিপূরিত পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন, তাহা অন্য দেশের লোক অধ্যয়ন করিলে তাহাদিগেরও মত-পরিবর্ত্ত ঘটিবার সম্ভাবনা। এ ভয়ও কোন কাজের ভয় নহে। এই ভারত সাম্রাজ্যে উদ্ভাবিত, বিচারিত, এবং প্রচারিত না হইয়াছে এমত মতবাদই নাই। বৌদ্ধেরাও ঈশ্বর স্বীকার করিত না—বর্ণভেদ মানিত না—বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকে নিন্দা করিত। অনেক রাজাও তাহাদিগের মতানুগামী হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কি হইয়াছে?—জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষার এক মাত্র উপায় সেই ধর্ম্মের প্রচারক এবং উপদেষ্টৃবর্গের বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা এবং পবিত্রতা—আর কিছুই নহে। যদি ধর্ম্মের উপদেষ্টৃ বর্গ তাদৃশ সক্ষম ও সদাচার হয়েন, তবে ধর্ম্মব্যাঘাতের কোন ভয় থাকে না। তাঁহাদিগের উপদিষ্ট ধর্ম্ম সজীব থাকে। সেই ধর্ম্ম অভিনব তথ্য সংগ্রহ দ্বারা সবল থাকিয়া সংসার রক্ষা করে। ফরাসী গ্রন্থকার দিগের পুস্তক সমুদায় আমাদিগের ছেলেরা অনেকেই অধ্যয়ন করে—তাহারা বলে বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে যাহা যাহা আছে তাহা ছাড়া ঐ সকল গ্রন্থে বড় কিছু নূতন নাই। যাহা হউক, আমার বিবেচনায় আমাদিগের ভ্রাতৃসন্নিভ রুসীয়, অষ্ট্রীয়, ইংলণ্ডীয় সম্রাট্‌দিগের ফ্রান্স দেশের প্রতি এই মতানুযায়ী ব্যবহার করা বিধেয়। ভারত সম্রাট্ এইরূপই করিবেন।” সভা ভঙ্গ হইল।

ঐ সভায় যিনি রুসীয় সম্রাটের প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি আপন স্বামীকে যে পত্র লিখিয়া পাঠান, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

“ভারত সম্রাটের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী আজিকার দরবারে যে সকল কথা বলিয়াছেন, সে সকলের অবিকল অনুবাদ প্রেরিত হইল। অন্যান্য রাজপ্রতিভূদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় বোধ হইতেছে—তাঁহারা ঐ সারবতী কথায় একান্ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাহারই মতানুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্ব স্ব কর্ত্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করিবেন। ভারত সম্রাটের অভিমতির বিপরীতাচরণ শ্রেয়ঃ নহে।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : কান্যকুব্জের চতুষ্পাঠী

গঙ্গা কল কল শব্দে চলিতেছেন। পূর্ব্বোপকূল অতিশয় উচ্চ—ত্রিংশৎ হস্তের ন্যূন হইবে না। মধ্যে মধ্যে ঐ কূলের ধার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ভগ্ন স্থানের অতি নিম্ন প্রদেশও কোথাও মনুষ্যাবাসের চিহ্নশূন্য নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর—কূপের পাট—মৃৎকলসাদি কৃত্রিম পদার্থ সকল সর্ব্বদাই বাহির হইয়া পড়িতেছে। ঐ স্থানটী সুপ্রসিদ্ধ কান্যকুব্জ নগর। উহার প্রান্তে যে অত্যুচ্চ প্রাসাদ একটী দেখা যাইতেছে, তাহার নাম "সীতাকারসুঁই"। প্রথিত আছে, সীতাঠাকুরাণী শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক বর্জ্জিত এবং বনে প্রস্থাপিত হইলে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে আসিয়া যেখানে বাস করেন, সেটী ঐ স্থান। ঐ স্থানে তিনি রন্ধন করিয়া বানপ্রস্থ ঋষিবর্গকে ভোজন করাইতেন। পূর্ব্বে ঐ স্থানে একটী দেবালয় ছিল। অনন্তর ঐ দেবালয় ভগ্ন করিয়া একটী মসজিদের নির্ম্মাণ হয়। পরে ঐ মসজিদ স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া উহার প্রস্তর সকল গ্রন্থিবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, প্রস্তরগুলিতে লক্ষ্মী, গণেশ, নারায়ণ প্রভৃতি দেব দেবীর যে সকল প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল—সেই মূর্ত্তিগুলিকে ভিতরে দিয়া মসজিদের প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল, প্রাচীর ভগ্ন হওয়াতে সেই মূর্ত্তি সকল আবার বাহির হইয়া আসিতেছে।

সীতাকারসুঁয়ের সর্ব্বোচ্চ ভাগে উঠিলে সমস্ত নগরটীকে একখানি সতরঞ্চের ছকের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

পল্লী গুলি স্বতন্ত্র; দুইটী পল্লী পরস্পর মেশামিশি হইয়া নাই—মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ-রাজী দ্বারা বিভিন্নীকৃত। এইরূপ হওয়াতে নগরটী সমধিক বিস্তীর্ণ—যত লোকের বাস তাহা অপেক্ষা আয়তনে অনেক অধিক বোধ হয়। কনোজের বিভিন্ন পল্লীগুলির নাম অনুসন্ধান করিলে ইহাই বোধ হয় যে, বিভিন্ন বর্ণসম্ভূক্ত জনগণ প্রায়ই বিভিন্ন পল্লীতে বাস করিয়া থাকে। মনুসংহিতায় নগরাদি নির্ম্মাণের যেরূপ বিধি আছে, কনোজ যে সেই বিধানের অনুসারেই প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং এখনও সেই নির্ম্মাণের কতক প্রকৃতি ধারণ করিয়া আছে, তাহার সংশয় নাই।

কান্যকুব্জ সম্প্রতি একটি প্রধান সমাজ স্থান। এখানে পৃথিবীর যাবতীয় সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ভাষার সমগ্র চর্চ্চা হইতেছে। নগরের ঠিক মধ্যভাগে একটী চতুষ্পাঠী। তাহার সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক সর্ব্বপ্রধান সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা প্রদান করেন। দ্বিতীয় অধ্যাপক গ্রীক ভাষা শিক্ষা করান—তৃতীয় অধ্যাপক লাটিন ভাষার শিক্ষা দিয়া থাকেন—চতুর্থ অধ্যাপক আরবী ভাষার শিক্ষা দেন। এই সকল প্রধান প্রধান অধ্যাপকের সহকারী অধ্যাপক অনেকগুলি করিয়া আছেন। ছাত্রেরা ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে কতকগুলি আরব পারস্য এবং তুর্ক স্থান হইতে, আর কয়েকটি ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে, বিশেষতঃ জর্ম্মণি এবং রুসিয়া হইতে, এখানে আসিয়া পাঠ সমাপন করিতেছেন। অধ্যাপক এবং ছাত্রদিগের নিমিত্ত বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে। উল্লিখিত কয়েক ভাষার প্রাচীন এবং নব্য, মুদ্রিত এবং অমুদ্রিত প্রায় সকল পুস্তকই ঐ চতুষ্পাঠীতে সংগৃহীত হইয়া আছে।

প্রাচীন পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে যিনি যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা সর্ব্বাগ্রে কনোজের চতুষ্পাঠীতে প্রেরিত হয়। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরা তাহার তথ্যাতথ্য বিচার করিয়া যেরূপ অভিমতি প্রকাশ করেন, গ্রন্থকার রাজকোষ হইতে তদনুযায়ী পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নূতন কাব্য নাটকাদির গুণাগুণও এই চতুষ্পাঠীতে বিচারিত

হইয়া থাকে। এখানকার একটী ছাত্র সম্প্রতি একখানি গ্রন্থ লিখিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, জর্ম্মণ, গ্রীক, এবং হিন্দু—তিনটি জাতিই এক মূল জাতি হইতে সমুৎপন্ন। আর একটী ছাত্র একখানি গ্রন্থ লিখিতেছেন; ঐ গ্রন্থ এখনও শেষ হয় নাই। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, জেন্দভাষার সহিত কাল্ডীয় এবং হিব্রু ভাষার সংযোগ সপ্রমাণ করিয়া পারসীক আবেষ্টা এবং য়িহুদীয় বাইবেলের পরস্পর একান্ত সংস্রবের নির্দ্দেশ করা। এই গ্রন্থের সমুদয় অংশ সংসাধিত হইলে প্রমাণিত হইবে যে, বেদপ্রমাণক হিন্দু, আবেষ্টা প্রমাণক পারসীক, বাইবেল প্রমাণক য়িহুদী ও খ্রীষ্টান এবং কোরাণ প্রমাণক মুসলমান, ইহাঁরা সকলেই মূলতঃ একই 'কেতাবী' জাতি। ভারতবর্ষীয় কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। এই রূপ নানা গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে, সে সকলের উল্লেখ করা বাহুল্য; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ যে মহাকাব্য সম্প্রতি প্রণীত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক। এই চতুষ্পাঠীর সর্ব্বপ্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক মহর্ষি সঞ্জীবন ঐ মহাকাব্যের প্রণয়ন করিয়াছেন।—উহা এক্ষণে পৃথিবীর সকল সভ্য জাতীয়ের ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ইহাতে ভারত-সাম্রাজ্যের "পুনরুত্থান" ব্যাপার যথাযোগ্য রূপেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। বাল্মীকির করুণা—হোমরের ওজস্বিতা, বর্জ্জিলের প্রসাদবত্তা—মিলটনের গভীরতা—ব্যাসের লৌকিকতা, মহর্ষি সঞ্জীবন প্রণীত "পুনরুত্থান" নামক মহাকাব্যে যে সংক্রান্ত হইয়াছে, ইহা সর্ব্বদেশীয় সকল আলঙ্কারিকেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : বারাণসীর বিদ্যালয়

বর্ষা কালে যখন গঙ্গার দুইটি করপ্রদা নদী বরণা এবং অসি পরস্পর মিলিত হইয়া যায়, তখন আরঙ্গেব বাদসাহের প্রতিষ্ঠিত মসজিদের ঊর্দ্ধ হইতে দেখিলে মৎস্যোদরী কাশীর কি অপরূপ সৌন্দর্য্যই অনুভূত হইতে থাকে। উত্তরবাহিনী গঙ্গার পূর্ব্বপার হইতে বারাণসীর সৌধশ্রেণী অবলোকন করিতে করিতে মনে হয়, ইহাই বুঝি চন্দ্রচূড়ের ললাট নিহিত চন্দ্রকলা। মৎস্যোদরী দেখিলে বোধ হয় এই স্থানটী সত্য সত্যই ত্রিশূলীর ত্রিশূলোপরি সংরক্ষিত। পৃথিবী প্রলয়জলে প্লাবিত হইয়া গেলেও এই পুরী মগ্ন হইবে না।

মৎস্যোদররূপা বারাণসীর সম্মুখপুচ্ছের সে স্থান যে পল্লী সেই পল্লীর নাম ত্রিপুরা ভৈরবী। উহা উত্তরে বিশ্বের এবং দক্ষিণে কেদার, এই উভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী। ঐ পল্লীতে একটী প্রধান চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই চতুষ্পাঠীতে বহু শাস্ত্রের চর্চ্চা হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, যাবতীয় নব্য ভাষা ঐ স্থানে শিক্ষিত হয়। ফরাসী, জর্ম্মণ, ইটালীয়, ইংরাজী, ফরাসী, হিন্দী—এই কয়েকটী ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র অধ্যাপকবর্গ নিযুক্ত হইয়া আছেন। অধ্যাপক এবং ছাত্রবর্গের নিমিত্ত বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে। ঐ সকল এবং অপরাপর চলিত ভাষার যাবতীয় পুস্তক ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকাগারে সংরক্ষিত হইতেছে। ঐ চতুষ্পাঠীর দক্ষিণ পশ্চিমদিকে আর একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে। তাহাতে জ্যোতিষ, গণিত, পদার্থতত্ত্বাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইয়া থাকে। রাজা জয়সিংহের প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির ঐ চতুষ্পাঠীর মধ্যেই পড়িয়াছে। এক্ষণে সেই মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার এবং আয়তন বৃদ্ধি হইয়া এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল আর নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। জ্যোতিষ্ক দর্শনের নিমিত্ত একটী সুপ্রশস্ত যন্ত্রাগারও ঐ স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ যন্ত্রাগারে অন্যান্য বহুবিধ যন্ত্রের মধ্যে এত বৃহৎ একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে যে, তাহা দ্বারা আর্দ্রা নক্ষত্রের পারিপার্শ্বিক গ্রহ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় এক্ষণে গণনা দ্বারা সেই গ্রহ দিগের কক্ষা নিরূপণ করিতেছেন।

এখানকার পদার্থ তত্ত্বাধ্যাপক মহাশয় সম্প্রতি একটী আবিষ্ক্রিয়া করিয়া প্রধান রাজমন্ত্রীর নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, জলে স্থলে আকাশে সর্ব্বত্র ইচ্ছানুসারে যান চালাইতে পারা যায়। ঐ কার্য্য অগ্নিতেজেও নির্ব্বাহিত হইতে পারে এবং তাড়িত প্রবাহেও সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু এখনও কোন বিশেষ পরীক্ষা বিধান দ্বারা তাহার সম্যক্‌ কার্য্যকারিতা প্রমাণিত হয় নাই—না হইবার কারণ এই যে, রাজমন্ত্রী অপর একটী সুবৃহৎ ব্যাপার সম্বন্ধে পরীক্ষাবিধান করিতেছেন। প্রসঙ্গাধীন এই স্থলেই তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। কাঞ্চীপুর নিবাসী পশুপতি নামক একজন মহামহোপাধ্যায় এক প্রকার অস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা হইতে এমনি মারাত্মক বাস্প নির্গত হয় যে, উহা আঘ্রাত হইবামাত্র প্রাণ বিনাশ করে। ঐ বাস্পের এরূপ ভয়ানক তেজঃ যে কাচের গাত্রে লাগিলে অমনি কাচ গলিয়া যায়।

মন্ত্রিবর এক্ষণে ঐ অস্ত্রের গুণ পরীক্ষা করিতেছেন। অস্ত্রের যেরূপ ক্ষমতা, তাহাতে বোধ হয়, উহার প্রভাবে পৃথিবী হইতে সংগ্রাম কার্য্য একেবারেই উঠিয়া যাইবে । আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে অস্ত্রের নাম “পাশুপত অস্ত্র” রাখা হইয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : বাণিজ্য এবং উপনিবেশ বিষয়ক

ভারতবর্ষের বাণিজ্য চিরকালই অতি বিস্তৃত। পুরাবিদ্ ডাইওনিসিয়স্ বলিয়া গিয়াছেন, “ভারতবর্ষের পরম সুন্দর ও সুখসেব্য শিল্প এবং কৃষিজাত দ্রব্য সমূহের লোভে পৃথিবীর সকল জাতীয় লোকেই ভারত রাজ্যে বাণিজ্য করিতে ধাবমান হয়। এরূপ হওয়াতে সকল দেশের ধনরত্নই ঐ দেশে যাইয়া পড়ে এবং ভারতরাজ্য প্রকৃত রত্নাকর হইয়া উঠিয়াছে।” এক্ষণে আবার ঐ ভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সিন্ধুমুখ হইতে কর্ণফুলির মুখ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের যে সুবিস্তৃত সমুদ্রোপকূল, তাহার সর্ব্বস্থল বণিক্-পোতে সমাকীর্ণ। বণিক্ পোতের মধ্যে দশ আনা দেশীয় মহাজন দিগের, ছয় আনা মাত্র বিদেশীয়দিগের। কত টাকার আমদানি রপ্তানি হইতেছে তাহা এই বলিলেই বোধ হইবে যে, চীনীয়েরা এখান হইতে শুদ্ধ আফিম লইতেছে না, চা, এবং রেশমও লইয়া যাইতেছে। ইংরাজেরা এখান হইতে চীনে, ইজরি প্রভৃতি মোটা এবং ঢাকা প্রসূত সরু কাপড় সকল লইয়া যাইতেছে; ফরাসীরা লক্ষ্ণৌয়ের ছিট মহা যত্ন করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইতেছে। অন্যান্য দ্রব্য যে কি পরিমাণে কত যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। একবার একটী গোলযোগের উপক্রম হইয়া ছিল। তাহার উল্লেখ করিলে সাম্রাজ্যের বাণিজিকী ব্যবস্থা কিরূপ, তাহা কতক উপলব্ধ হইবে বলিয়া তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। ইংলণ্ড দেশে এক বার সূত্র প্রস্তুত করিবার এবং বস্ত্র বয়ন করিবার কলের উৎকর্ষ সাধন হইয়া গেলে, এক বৎসর ইংরাজ বণিকেরা কয়েকখানি জাহাজ বোঝাই করিয়া কার্পাস সূত্র এবং কাপড় পাঠাইয়া ছিল। ঐ সূত্র এবং বস্ত্র এখানে কিছু সস্তাদরে বিক্রীত হইয়া গেল। এই ব্যাপার ঘটিলে এখানকার তন্তুবায় সম্প্রদায় সম্রাটের নিকট এই বলিয়া আবেদন করে যে, বর্ষ কয়েকের নিমিত্ত ইংরাজি সুতা এবং কাপড়ের উপর অধিক পরিমাণে শুল্ক গৃহীত হউক, নচেৎ আমাদের ব্যবসায় মারা যায়। সম্রাট্ আজ্ঞা দিলেন যে, তিন বৎসর মাত্র শুল্ক গৃহীত হইবে। ইংরাজেরা ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল, এবং স্বাধীন বাণিজ্য প্রণালী যে যুক্তি সঙ্গত তাহা বিচার করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত সম্রাটের নিকট আপনাদিগের রাজদূত পাঠাইল।

বিচারে এই অবধারিত হইল যে, বার্ত্তা শাস্ত্রের নিয়ম সকল সমস্ত পৃথিবীকে একটী মহা সাম্রাজ্যরূপে জ্ঞান করিয়াই আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব যতদিন পৃথিবীতে রাজ্যভেদ থাকিবে, ততদিন সম্পূর্ণরূপে ঐ সকল নিয়ম সর্ব্বত্র খাটিতে পারে না। তদ্ভিন্ন, ইতিহাস পর্য্যালোচনার দ্বারা ইহাও সপ্রমাণ হইল যে, যখন যে জাতির শিল্পদ্রব্য উৎকৃষ্ট এবং সুলভ মূল্যে প্রস্তুত হয়, তখনই সেই জাতি স্বার্থসিদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে ঐ শিল্পজাতের স্বাধীন বাণিজ্যের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। অতএব স্বাধীন বাণিজ্যের নিয়মটী এমন নিয়ম নয় যে, দেশকালাদির অপ্রভেদে প্রচলিত থাকিতে পারে।

যাহা হউক ইংরাজী সূত্র বস্ত্রাদির উপর প্রথম বর্ষে যে শুল্ক নিরূপিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় বর্ষে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র রহিল, এবং তৃতীয় বর্ষে এখানকার তন্তুবায় সম্প্রদায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই শুল্ক উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিল। তখন শুল্ক উঠিয়া গেলেও আর ইংরাজি সূত্র বস্ত্রাদি আমদানি হইতে পারিল না। তন্তুবায়েরা কল বসাইয়া এত সুলভ মূল্যে প্রস্তুত করিতেছে যে ইংরাজী বস্ত্র তাহা অপেক্ষা অধিক সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে না।

ফলতঃ সাম্রাজ্যের বাণিজিকী ব্যবস্থা এই মূল নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিল। শিল্পপ্রসূত যে সকল দ্রব্য এদেশে জন্মিতে পারে, তাহা ভিন্নরাজ্য হইতে আসিলেই প্রথম দুই এক বর্ষ তাহার উপর শুল্ক নিরূপিত হয়; অনন্তর ঐ দ্রব্য এখানে সুলভ মূল্যে প্রস্তুত হইলেই অমনি শুল্ক উঠাইয়া দিয়া বাণিজ্য স্বাধীন করিয়া দেওয়া হয়। মার্কিনেরা ভারতবর্ষের দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া কোন কোন স্থলে আপনাদিগের শিল্প জাত সম্বর্দ্ধিত করিয়া লইতে পারিয়াছে।

বাণিজ্যের স্থূল নিয়ম এই। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন ভারত সম্রাট্ বাণিজ্য বিস্তার বিষয়ে তেমন ব্যগ্র নহেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী একদিন সবিশেষ চিন্তাকুলিত হইয়াই বলিয়াছিলেন যে, যন্ত্রাদি যোগে শিল্প কার্য্যের বাহুল্য সাধন করায় যেমন উপকার হয়, তেমনি অপকারও হইয়া থাকে। দেশের মধ্যে কতকগুলি লোক আঢ্য হইয়া উঠে, কিন্তু অপর সকলে অন্নাভাবে হাহাকার করিতে থাকে। অতএব শিল্পকার্য্যের আধিক্য এবং উৎকর্ষ সাধন যেমন এক পক্ষে উপকারক, তেমনি পক্ষান্তরে প্রজাব্যূহের মধ্যে অর্থ সম্বন্ধীয় বিজাতীয় বৈসাদৃশ্য জন্মাইয়া দিয়া অপকারক হয়। এদেশে যদিও বংশমর্য্যাদানুযায়ী বর্ণভেদের প্রথা প্রচলিত থাকাতে এবং অত্যুদার আর্য্য শাস্ত্রের বিধিপালনে অভ্যাস বশতঃ জনগণ নিতান্ত পর দুঃখে কাতর হওয়াতে ঐ দোষ সম্যক্ অনিষ্ট সাধন করিতে পায় না, তথাপি অর্থ সম্বন্ধীয় তাদৃশ বৈসাদৃশ্য অনেক ভাবি অনিষ্টের হেতু হইতে পারে। মন্ত্রিবর এ কথাও বলেন যে, উপনিবেশ স্থাপনের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে ঐ দোষের নিবারণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া যেখানে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়া পর জাতির লোকের প্রতি অত্যাচার করাও ত বিধেয় নহে।

যাহা হউক, মন্ত্রিবরের পরামর্শানুসারে সম্প্রতি এই ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে যে, ভারতবর্ষীয়েরা পরদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়া সেই সেই দেশে কদাপি ভূম্যধিকার গ্রহণের চেষ্টা করিবে না। যে যে দেশে ধনস্পৃহা বশতঃ বাণিজ্য করিতে যাইবে, সেই দেশের ব্যবস্থার বশীভূত হইয়া চলিবে,—আর যে দ্বীপাদিতে মনুষ্যের বাস নাই অথবা নিতান্ত অল্প মনুষ্যের বাস সেই সেই দ্বীপ ভিন্ন অপর কোন স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিবে না। যদি উপনিবেশিত দ্বীপাদিতে ভিন্ন জাতীয় লোক থাকে, তবে তাহাদিগকে সংস্কারপূত করা এবং তাহাদিগের সহিত অনুলোম ক্রমে বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া দেশটীকে সর্ব্বতোভাবে ভারতভূমির অনুরূপ করাই ঔপনিবেশিকদিগের পক্ষে বিধেয়। এখনও ভারতীয় উপনিবেশ অধিক নাই। আন্দামান, নিকোবর এবং মল্ল দ্বীপ পুঞ্জ উপনিবেশিত হইয়া গিয়াছে। সুমাত্রা, যব, বালি এবং সুখতর দ্বীপেও উপনিবেশের সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে।

ঔপনিবেশিকদিগের সম্রাটের নিকট কর দিতে হয় না, কিন্তু তাহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত যে কয়েকখানি রণপোত থাকে, তাহার সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়।

ভারতবর্ষীয় ঔপনিবেশিকেরা চিরকাল ভারতভূমিকে মাতৃভূমি বলিয়া জানিবে। পশু শাবকের ন্যায় স্তন্য ত্যাগ করলেই প্রসূতিকে বিস্মৃত হইবে না।

নবম পরিচ্ছেদ : আতিথ্য উৎসবাদি বিষয়ক

ভারতবর্ষীয় জনগণ যে দুইটী প্রধান উপাদানের সমবায় সংঘটিত, সে উভয়েরই প্রকৃতিতে দান ধর্ম্ম প্রবল ছিল। ঐ উপাদানদ্বয় সম্মিলিত হওয়াতে ঐ ধর্ম্মের বিশেষ প্রাচুর্য্যই জন্মিয়াছে। গৃহী মাত্রেই বিশিষ্ট সমাদরপূর্ব্বক আতিথ্য করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন প্রতি গ্রামের দেবালয়ে একটী গ্রামিক অতিথি শালা আছে। তাহার কার্য্যভার গ্রাম্য যাজক এবং নাপিতের প্রতি অর্পিত। উহার ব্যয় গ্রামিকদিগের সাধারণ চাঁদা হইতে নির্ব্বাহিত হয়।

ভূম্যধিকারীরা, নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে যত পান্থাবাস আছে, সমুদায়ের বিশেষ তত্ত্বাবধান করেন, এবং আপনাপন আলয়ে সদাব্রত দেন।

কেহ ইচ্ছা করিলে এক কপর্দ্দক মাত্র ব্যয় না করিয়াও যাবজ্জীবন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারেন। কাহারও আলাপ পরিচয় নাই বলিয়া কোথাও আহার পরিধেয়ের বা শয়নের ব্যাঘাত হইবে, তাহা হয় না।

দেশীয় জনসমূহের প্রকৃতি এরূপ উদার এবং বিশ্বস্ত হওয়াতে সমাজ মধ্যে যে দোষটী জন্মিবার সম্ভাবনা, রাজব্যবস্থা দ্বারা তাহার নিবারণের চেষ্টা হইতেছে। অনেক লোকেই কার্য্যবিরত হইয়া অপরের গলগ্রহ হইয়া পড়িতেছিল, তজ্জন্য এক্ষণে এই রাজ নিয়ম হইয়াছে—(১ম) বিশেষ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে না পারিলে কোন ব্যক্তি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ফকিরী লইতে পারিবে না। (২য়) অবশ্যপোষ্য কেহ বিদ্যমান থাকিতে কোন ব্যক্তি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না। (৩য়) কোন ব্যক্তি বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে এক স্থানের সদাব্রতে তিন দিনের অধিক অবস্থান করিতে পারিবে না। প্রদেশাধিকারিগণ স্ব স্ব অধিকার মধ্যে এইরূপ নিয়মের অনুযায়ী কার্য্য করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগেরই কয়েক জন প্রথমে প্রস্তাব করিয়া ঐ সকল ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু গ্রামিকেরা এবং কোন কোন ভূম্যধিকারীও মনে মনে এই সকল ব্যবস্থার প্রতি তেমন অনুকূল বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক ভিক্ষোপজীবিতার যে কতক দমন হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

এই সকল ব্যবস্থা প্রণয়ন করাইবার সময় ব্যবস্থাপক সভায় এক জন রাজমন্ত্রী যে বক্তৃতা করেন, তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "প্রকৃতরূপে দান ধর্ম্ম পালন বড় কঠিন কর্ম্ম। দান যেমন দাতার পক্ষে পুণ্যবর্দ্ধক, তেমনি গ্রহীতারপক্ষে পাপজনক। তুমি দান করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলে, আমি তোমার দান গ্রহণ করিয়া আত্মগ্লানি প্রাপ্ত হইলাম। অতএব একবারে উভয় দিক হইতে দেখিলে দানের দ্বারা যে দেশমধ্যে ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইল, একথা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু দানের অধিকও ত ধর্ম্ম নাই—সুতরাং উহার পালন না হইলে ধর্ম্মবৃদ্ধির পথই লুপ্ত হয়। অতএব এমত কোন উপায় করা আবশ্যক, যাহাতে দান গ্রহীতার আত্মগ্লানি জন্মিতে না পারে। তাহা হইলেই দাতার ধর্ম্মবৃদ্ধি হইল, অথচ গ্রহীতার গ্লানি হইল না। সে উপায় কি? সে উপায় এই—দেশের মধ্যে ধর্ম্মবৃদ্ধি এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যে সকল লোক নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা বাস্তবিক অন্যের উপকারার্থে আপনাদিগের সাংসারিক সুখচিন্তা পরিহার করিয়াছেন। তাঁহারাই দানের সর্ব্ব প্রধান পাত্র। যাহাকে তাহাকে দান না করিয়া ঐ

সকল লোককেই দান করা বিধেয়। উঁহারা যেরূপ উচ্চপদস্থ ও যেরূপ উন্নতকার্য্যে চিরব্রতী, তাহাতে অন্যের স্থানে দান গ্রহণ করা তাহাদিগের অন্তঃকরণে গ্লানিজনক হইতে পারিবে না। তাঁহারা যে দান গ্রহণ করিবেন, তাহা দাতার কৃতজ্ঞতা সূচক বলিয়াই মনে করিবেন; আপনাদিগের অধীনতা ব্যঞ্জক মনে করিবেন না। অতএব দান ধর্ম্ম পালনের প্রকৃত স্থল দেশের শিক্ষাদাতা ব্রাহ্মণগণ। অন্ধ, অথর্ব্ব, অক্ষম লোকেরা যে দয়ার একান্ত পাত্র, তাহা বলিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ উহারা অবশ্য পোষ্যের মধ্যেই গণ্য। সুতরাং তাহারা অন্যদীয় সাহায্য গ্রহণ করিলে কখনই আত্মগ্লানির ভাজন হয় না। অতএব দান ধর্ম্ম পালনের মূল নিয়ম এই—'যাহারা অন্যদীয় সাহায্য গ্রহণে নীচতানুভব করিতে না পারে, তাহারাই দানের পাত্র, অপরে দানের পাত্র নহে।' যিনি এই মূল সূত্র স্মরণ পূর্ব্বক আত্ম-সংযম সহকারে দান করিতে না পারেন, তাঁহার দান ক্রীড়ার ন্যায় সুখজনক হইতে পারে, কখনই ধর্ম্ম বর্দ্ধক হইতে পারে না।"

মন্ত্রি-মহাশয়ের মূল নিয়ম ভারতবর্ষীয় দিগের সরল উদার এবং বিশ্বাস-প্রবণ হৃদয়ে কি পরিমাণে স্থান গ্রহণ করিবে, কতদূরই বা কার্য্যকালে স্মৃতি পথে আসিবে, তাহা বলা যায় না।

ভারতবর্ষবাসীদিগের এই অসীম দানশীলতাই তাহাদিগের উৎসবোপলক্ষে ব্যয় বাহুল্যের মুখ্য কারণ। তাঁহারা কিছু স্বভাবতঃ তেমন আমোদ প্রিয় নহেন। প্রত্যুত আমোদপ্রিয়তা অপেক্ষা তাঁহাদিগের পরিণামদর্শিতা এবং মিতাচারিতা পরিমাণে অধিক। কিন্তু তাহা হইলেও উৎসব উপলক্ষে অজস্র দান করিবার সুবিধা হয় বলিয়া ভারতবর্ষীয়েরা একান্তই উৎসবভক্ত। হিন্দুদিগের এবং মুসলমানদিগের যতগুলি পূর্ব্ব উৎসব ছিল, সকল গুলিই এখনও জাগ্রৎ আছে, তদ্ভিন্ন অপর কএকটী নূতন উৎসব দেশে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। সাম্রাজ্য সংস্থাপনের দিন এবং সম্রাটের জন্মদিন, এই দুইটী দিন নূতন পর্ব্বাহ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন প্রধান প্রধান কবি, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ এবং আবিষ্কর্ত্তাদিগের নামে, তাঁহারা যে যে প্রদেশে জন্মিয়াছিলেন, সেই সেই প্রদেশে, এক একটী মেলা হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও ঐরূপ মেলা এবং প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান পর্ব্ব একদিবসে পড়িয়া তিনটীতে মিলিয়া একটী অপূর্ব্ব পদার্থ হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীরামনবমী, মহরম ও বাল্মীকি পর্ব্ব ঐরূপে একত্রিত হইয়া গিয়াছে। অনেকের স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, যে রাবণ, সেই এজিদ্, যে হোসেন, সেই লক্ষ্মণ, যে হনুমান, সেই জেব্রিল, রামচন্দ্রে এবং পাইগম্বরে অভেদ। কেমন করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইল, তাহা নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু যখন প্রাচীন আর্য্যজাতীয়দিগের মদনোৎসব, রোমীয় দিগের কার্ণিবল্, এবং টিউটন্ জাতীয় দিগের মেপোল নিত্য সম্মিলিত হইয়া নব্য ইটালীয় দিগের কার্ণিবল জন্মিতে পারিয়াছে, তখন এক দেশ নিবাসী হিন্দু মুসলমানদিগের পর্ব্ব যে সম্মিলিত হইয়া যাইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? ইটালী দেশীয় কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া এখানকার একটী উৎসব উপলক্ষে তাঁহার স্বদেশীয় বন্ধুকে যেরূপ লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"আজি সরস্বতী পূজা—প্রতিগ্রামে প্রতিগৃহে সরস্বতী দেবী-প্রতিমা অর্চ্চিত হইতেছে। মনে করিও না যে, ভারতবর্ষীয়গণ ঐ মৃন্ময়ী প্রতিমাকেই ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া তাহার পূজা করে। প্রতিমার যেরূপ রূপ তাহা বিবেচনা করিলেই বিজ্ঞব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, সরস্বতী দেবী মূর্ত্তিমতী বিদ্যা বই আর কিছুই নহে। মূর্খেরা এবং নাস্তিকেরাই ওরূপ অর্চ্চনাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া গালি দেয় কিন্তু ঐ সকল লোক আমাদিগকেও ত পোতুলিক বলিয়া থাকে। অতএব উহাদিগের কথায় প্রয়োজন নাই।

"সরস্বতী বিশুদ্ধা, অতএব শুভ্রবর্ণা, সরস্বতী-হৃৎপদ্মে বিরাজ করেন, অতএব পদ্মাসনা,—সরস্বতী একান্ত কমনীয়া, অতএব কামিনীরূপা, সরস্বতী গ্রন্থ এবং সংগীতময়ী, অতএব পুস্তকহস্তা এবং বীণা পাণি। আমি যখন ঐ দেবীমূর্ত্তির প্রতি অনিমিষ নয়নে দৃষ্টি করিয়া এই সমস্ত সাদৃশ্য উপলব্ধ করিতেছিলাম, চতুর্দ্দিকে ধূপ, ধুনা ও গন্ধরসের ধূম উত্থিত হইয়া দৃষ্টি অস্ফুট এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় পূর্ণ করিতেছিল। বামাকণ্ঠ বিনিঃসৃত সংগীত রবে কর্ণকুহর অমৃতায়মান হইতেছিল, তখন সেন্ট পীটরের গির্জ্জার মধ্যে গমন করিলে যে ভাব হয়, অবিকল সেই ভাব মনোমধ্যে উদিত হইল। তথায় ভগবতী মেরি মূর্ত্তি—এখানে সরস্বতী মূর্ত্তি, সেখানেও সুগন্ধি ধূমোদ্গম সহ সুমধুর বাদন, এখানেও তাই; সেখানেও চিরকুমারী গণের সংগীত, এখানেও রূপ লাবণ্যবতী কামিনী কুলের কলস্বর; সেখানেও লাটিন ভাষায় সুগভীর স্বরে সমুচ্চরিত ভজনার আবৃত্তি, এখানেও সংস্কৃত ভাষায় সুললিত স্তুতিপাঠ। ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত আমাদিগের উৎসব প্রকৃতির সর্ব্বথা সাদৃশ্য আছে। যখন ভারতবর্ষীয়েরা স্বাধীনতা লাভ করিয়া এমন প্রধান হইয়া

উঠিয়াছে, তখন কি ইটালীর ভাগ্যবৃক্ষেও কোন কালে ঐ অমৃত ফল ফলিবে না! আমার জানা আছে, কেহ কেহ বলেন যে, কাথলিক মতবাদ এবং তদনুযায়ি ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ না করিলে ইটালীয়েরা কখনই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত আমাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সম্যক সাদৃশ্য সত্ত্বেও ত ভারতবর্ষীয়েরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান পদারূঢ় হইয়াছে। অতএব যাঁহারা স্বাধীনতা প্রাপ্তি পক্ষে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তের প্রয়োজন প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের কথা একান্ত হেয়, কিন্তু এ পত্রে তোমার নিকট বিচারের কথা লিখিয়া পাঠাইব মনে ছিল না। অনুচিকীর্ষা পরায়ণ মূর্খদিগের আস্ফালন বাক্যে নিতান্ত প্রাণ জ্বলে বলিয়া আমার সময় অসময় বোধ থাকে না, সর্ব্বদা ঐ কথাই বাহির হইয়া পড়ে।

“সরস্বতী দেবীর পূজা এবং স্তব পাঠ সমাপন হইলে সকলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ভারতবর্ষীয়েরা সর্ব্ব বিষয়েই বয়োধিক দিগের সম্মান রক্ষা করে। পুষ্পাঞ্জলি দানেও দেখিলাম, আগে বড়, তার পরে ছোট এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে একে একে আসিয়া সকলে পুষ্পাঞ্জলি দিল। যে কুলবধূগণ সম্মিলিত হইয়া সুমধুর স্বরে দেবীর স্তবপাঠ করিয়াছিল, তাহাদিগেরও পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হইল। অনন্তর অতি সুন্দর বেশ ধারণ পূর্ব্বক কতকগুলি বালক এবং বালিকা আসিয়া দেবীর সমক্ষে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইল, এবং মৃদু মধুর স্বরে কএকটী গান গাইল। শুনিলাম ঐ গান গুলি ঐ সময়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল।

“এই রীতিটি আমাকে বড়ই ভাল লাগিয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা ছেলে বেলা অবধি যেমন ভক্তির শিক্ষা দেয়, আমরা কি অন্য ইউরোপীয়েরা তাহার শতাংশও দিই না। এই জন্যই ইউরোপের লোক সকল এত উচ্ছৃঙ্খল এবং স্বার্থপর হইয়াছে।

“আবার বিচার আসিয়া পড়িল। কি করি নিজের দেশটী এমন হয়না কেন? এই ভাবটী মনোমধ্যে চির জাগরূক হইয়া উঠিয়াছে, আর নিবৃত্ত করিবার নহে।

“পরদিন প্রতিমার বিসর্জ্জন। বিসর্জ্জন? তবে আর কে কোন্ মুখে বলিবে যে, ভারতবর্ষীয়েরা মৃন্ময় দেব মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর মনে করে? তাহা করিলে কি বিসর্জ্জন করা সঙ্গত হইত? কিন্তু অমন সুন্দর মূর্ত্তির কিরূপে বিসর্জ্জন করিবে? তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। উহা মাটীর, পাথরের নয়। পাথরের হইলে আমাদের মাইকেল এঞ্জিলোর ভাস্করীয় মূর্ত্তির সহিত তুলিত হইতে পারিত, প্রতিমাটীর এমনি দিব্য গঠন।

“কিন্তু ভারতবর্ষীয় দিগের সর্ব্ব প্রকার ঐশ্বর্য্যই পৃথিবীতে তুলনা রহিত। উহারা যেমন অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াও দরিদ্র হয় না, তেমনি এমন সকল প্রতিমাকে জলে ফেলিয়া দিয়াও শিল্প নৈপুণ্যের অভাব হইবে মনে করে না। যাহাদিগের অধিক থাকে তাহারা অধিক ব্যয় করিতে পারে। ভারতবর্ষীয় দিগের সকলই অধিক। ধন ও যেমন, বিদ্যা ও তেমন, শিল্পচাতুর্য্য ও । উহারা সকলই ফেলিয়া ছড়িয়া খরচ করিতে পারে। আমাদিগের মত কিছুই পুতু পুতু করিয়া তুলিয়া রাখে না।

“আর একটী কথা বাকী আছে। সরস্বতী দেবীর পরিধেয় একখানি শাটী মাত্র। পূর্ব্বে এদেশের স্ত্রীলোকেরা ঐরূপ পরিধান মাত্র ব্যবহার করিত। এখনও যতক্ষণ বাটীর ভিতরে থাকে, শাটীই পরে। শাটী পরিলে এদেশে স্ত্রীলোকদিগকে মন্দ দেখায় না। কিন্তু এখন ইহারা বাহিরে অসিতে আরম্ভ করিয়াছে। অতএব পরিধানের ও পরিবর্ত্ত করিয়াছে। ঢিলে পা-জামা এবং কাঁচুলি পরিয়া তাহার উপর একটী সুদীর্ঘ অঙ্গরক্ষিণী দেয়, এবং সর্ব্বোপরি মাথার উপর বেড় দিয়া ধারণ করে।

“পুরুষেরা পূর্ব্বে কেবল মাত্র ধুতি পরিত। বাটীর মধ্যে এখনও তাহাই পরে। কিন্তু বাহিরে ইজের চাপকান গলাবন্ধ এবং উষ্ণীশ ব্যবহার করিয়া থাকে।

“এদেশ গ্রীষ্ম প্রধান, এখানে অধিক কাপড় অথবা নিতান্ত মোটা কাপড় সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে হইলে বড় যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। ভারতবর্ষীয়দিগের পরিচ্ছদ তাহাদিগের দেশের যোগ্য এবং আকারের যথা যোগ্যই হইয়াছে।”

দশম পরিচ্ছেদ : আভ্যন্তরিক অবস্থা

ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা কিরূপ তাহা বলিবার নিমিত্ত কএকটী প্রসিদ্ধ পর্য্যটকের গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ঐ পর্য্যটকেরা এই মহাদেশের নানা ভাগে পরিভ্রমণ করিয়া যাঁহার চক্ষে যাহা কিছু বিশেষ রূপে লাগিয়াছে, তাহাই সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে তৎসমুদায় সংক্ষেপতঃ উল্লিখিত হইবে। একজন রুষীয় পর্য্যটক লিখিয়াছেন।—

“ভারতবর্ষের প্রতি গ্রামই যেন একটী প্রজা তন্ত্র স্থান। গ্রামের যাবতীয় কার্য্য গ্রামের লোকেরাই স্বয়ং নির্ব্বাহ করে। রাজা অথবা রাজ প্রতিনিধি কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে হয় না। প্রতি গ্রামেই এক একটী দেবালয় আছে, সেই দেবালয়ের সন্নিহিত প্রাঙ্গণে গ্রামবাসী দিগের সভা হয়। গ্রামের প্রতিপল্লী হইতে ঐ সভায় এক একজন প্রতিনিধি উপস্থিত হন, পরে বিচার্য্য বিষয়ে বাদানুবাদ হইয়া যাহা অবধারিত হয়, সকলে তদনুযায়ীই কার্য্য করে। আমাদিগের রুষিয়াতেও ঐ প্রণালী প্রচলিত আছে। তবে আমাদের দেশে প্রতি গ্রামে কতকগুলি করিয়া লোক দাস্যে নিযুক্ত থাকে। ভারতবর্ষে সেরূপ নাই। আর একটী প্রভেদ এই— রুষিয়ার গ্রাম সকলের ভূমিতে প্রজাগণের সাধারণ স্বত্ব আছে, এখানে সেরূপ সাধারণ স্বত্ব নাই। এখানে গ্রামের প্রতি ভূমিখণ্ডে গ্রামিক বিশেষের অসাধারণ স্বত্ব আছে। কিন্তু রাজস্ব দান প্রতি ভূমিখণ্ডের জন্য পৃথক না হইয়া সাধারণতঃ গ্রামের জন্যই একবারে হইয়া থাকে। এক কালে গ্রীক দিগের মধ্যে যেমন এথিনীয়েরা প্রথমতঃ ব্যক্তিনিষ্ঠ অসাধারণ স্বত্বাধিকার বুঝিয়াছিল ভারতবর্ষীয় দিগের মধ্যেও এক্ষণে সেইরূপ স্বত্বাধিকার প্রচলিত আছে, কিন্তু যেমন রোমীয়দিগের কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব্বে স্পার্টার লোকেরা সেরূপ স্বত্বের অধিকারী হইতে পারে নাই, এক্ষণে রুষীয়েরাও সেইরূপ আছেন। রুসিয়ার গ্রামিক দিগের অধিকার স্পার্টার ন্যায়, ভারতবর্ষে এথিনীয় দিগের ন্যায়, কিন্তু কয়েকটী বিষয়ে সাধারণ স্বত্বের চিহ্ন এখানেও বিদ্যমান আছে। গ্রাম রক্ষক, নাপিত, গ্রাম্য যাজক এবং গুরু মহাশয় এই কয়েক ব্যক্তি গ্রামিক ভূমির সাধারণ স্বত্বের এক এক অংশের অধিকারী। এদেশে ঐ সকল ভূমির নাম চাকরাণ, দেবোত্তর এবং মহোত্তর ইত্যাদি।

“প্রতি গ্রামে যেমন এক একটী দেবালয় আছে, তেমনি এক একটী ব্যায়াম শিক্ষার স্থান এবং বিদ্যালয়ও আছে। ছেলে পাঁচ বৎসরের হইলেই বিদ্যালয়ে যায়, এবং ৮ বৎসরের হইলেই ব্যয়াম-শিক্ষা আরম্ভ করে। ওরূপ করতে হইবে বলিয়া যে কোন রাজনিয়ম আছে এমত নহে, কিন্তু ব্যবহারই এইরূপ। ধান্য ভূমি? সেখানকার লোক সকল স্বতঃই সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, আইনের বলের অপেক্ষা করে না।”

একজন জর্ম্মণ পর্য্যটক লিখিয়াছেন, “আমি এদেশে (ভারতবর্ষে) আসিয়া একটী প্রধান তথ্য শিখিলাম। ইউরোপ খণ্ডের সর্ব্বত্র দেখিয়া এবং ইউরোপীয় ইতিবৃত্তের পর্য্যালোচনা করিয়া আমার সংস্কার হইয়া গিয়াছিল যে, মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে অপর সকল বৃত্তি অপেক্ষা স্বার্থপরতা বৃত্তিই অধিকতর প্রবল। কিন্তু দেশের জন্ম বাতাসের গুণেই হউক, আর মিতাহার গুণেই হউক, আর পুরুষানুক্রমিক শিক্ষার প্রভাবেই হউক, ভারতবর্ষীয় দিগের অন্তঃকরণে স্বার্থপরতা তেমন প্রবল বলিয়া বোধ হয় না। আমরা নিজস্ব রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকি, নিরন্তর স্বত্বাধিকার লইয়াই বিবাদ করি, যাহা আপনার বলিয়া বোধ করিয়াছি, তাহ কোন মতেই ছাড়িয়া দিতে পারি না— কিন্তু এদেশীয় দিগের প্রকৃতি অন্যরূপ। ইহাদিগের মধ্যে আত্মপর বোধ অল্প—ঔদার্য্য গুণ অধিক।

"তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, এখানকার ভূম্যধিকারিগণ কদাপি স্ব স্ব অধীন গ্রামিকগণের স্বত্ব লোপ করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন না— পক্ষান্তরে গ্রামিকেরা ও ভূম্যধিকারীদিগের প্রতি চিরসন্দিগ্ধ চিত্তের ন্যায় ব্যবহার করে না। ইউরোপ খণ্ডে ঐ ব্যাপার লইয়া কত তুমুল বিবাদ হইয়া গিয়াছে। জর্ম্মণির মধ্যে সেই বিবাদ অদ্যাপি চলিতেছে। ভারতবর্ষে তাহার নাম গন্ধও নাই। এখানকার ভূম্যধিকারিগণের প্রধান কার্য্য (১ম) গ্রামিকদিগের স্থানে রাজস্ব আদায় করা (২য়) গ্রামিকেরা শান্তিভঙ্গাদি দোষের কিরূপ বিচার করে, তাহার তত্ত্বাবধান করা, (৩য়) আপনাপন অধিকারের মধ্যে রাস্তা, ঘাট, জলাশয়, বিপণি এবং দেবালয়াদির রক্ষণ এবং নূতন নির্ম্মাণ করা, (৪র্থ) আপনাপন আবাস স্থানে অথবা তাদৃশ সমৃদ্ধ নগরে একটী চতুষ্পাঠী সংস্থাপন, তাহার বৃত্তি নির্দ্ধারণ এবং উৎকর্ষ সাধন করা।

"সম্প্রতি ভূম্যধিকারিগণ আর একটী কার্য্যের সূত্রপাত করিতেছেন। তাঁহারা অনেকে মিলিয়া ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছিলেন যে, ২০ বর্ষ হইতে ৪০শ বর্ষ বয়স্ক যাবতীয় গ্রামবাসী প্রজাকে মাসের চারি দিন সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ বিদ্যা অভ্যাস করিতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা প্রণীত হয়। যদিও ব্যবস্থা প্রণীত হয় নাই, কিন্তু ইচ্ছাতঃ সকলেই তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারেন, সম্রাট্ এই অভিপ্রায় করিয়াছেন। তাহাতে অনেকেই তাহার পূর্ব্বানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষীয়দিগের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্ত যে কিরূপ হইয়াছে তাহার একটী দৃষ্টান্ত এই। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জাতিভেদের বড়ই আঁটা আঁটি ছিল। এক্ষণে তাহা অনেক কম হইয়াছে।

"সেদিন একজন ক্ষত্রিয় ভূম্যধিকারীর গৃহে অতিথি হইলে তিনি স্বচ্ছন্দে আমার সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিলেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্ব ব্যবহার এরূপ ছিল না, এক্ষণে এরূপ হইয়াছে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথার একটী প্রাকৃতিক মূল আছে; উহা নিতান্ত কৃত্রিম বস্তু নহে, এইজন্য উহা অদ্যপি চলিতেছে, আরও কিছুকাল চলিবে। তদ্ভিন্ন তখন অমাদিগের যে দশা, তাহাতে জাতিভেদের বিশেষ আঁটা আঁটি রক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিল। তখন আমাদিগের দেশ স্বাধীন ছিল না, ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। সাহিত্য শাস্ত্রেরও উন্নতি হয় নাই। আমাদিগের জাতিত্বই বিনাশ দশায় পতিত হইয়া যাইতেছিল। সে সময়ে যদি বিশেষ যত্ন করিয়া আপনাদিগের প্রাচীন সামাজিক প্রণালী সমুদায় রক্ষা না করিতাম, তবে এতদিন আমরা বিলুপ্ত হইয়া যাইতাম, এখন আমাদিগের দেশ স্বাধীন—ধর্ম্ম সজীব—সাহিত্য পুনরুজ্জীবিত হইয়া জাতিত্ব রক্ষা করিতেছে। এখন আর কেহ আমাদিগকে আত্মসাৎ করিতে পারে না, প্রত্যুত আমরাই অন্যকে অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারি। আমরা পূর্ব্বে যে ভয়ে জড়ীভূত হইয়াছিলাম, এখন আমাদিগের আর সে ভয় নাই। ঐ ব্যক্তি কিছুকাল পারীস নগরে গিয়া বাস করিয়া আসিয়াছেন। ইঁহার শিক্ষা বারাণসীর চতুষ্পাঠীতে হইয়াছিল। "ভারতবর্ষের অধিংশ ভূম্যধিকারীই এই প্রকৃতির লোক।" একজন ইংলণ্ডীয় পর্য্যটক লিখিয়াছেন—

"এখন সকলেই এদেশে ভ্রমণ করিতে আইসে, কিন্তু এখানে যে এমন কি অপূর্ব্ব পদার্থই দেখিতে পায় বলিতে পারি না। সত্য বটে, এখানকার নগরগুলি যেমন সমৃদ্ধিশালী তেমন আর কুত্রাপি নাই। পারীস, রোম, মেড্রিড, বর্লিন, প্রভৃতি ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর নগরগুলি এখানকার লক্ষ্ণৌ, প্রয়াগ, অযোধ্যা, লাহোর প্রভৃতির তুল্য নয় বটে, আলহাম্ব্রা, কোলিসিয়ম, পার্থিনন্, থীব্স এবং পালমাইরার প্রধ্বস্তাবশেষ এখানকার ফতেপুর সিক্রি, ইলাবরা, হস্তীদ্বীপ এবং মহাবলিপুরের নিকট লজ্জা পায় বটে, পারীস লিডেন, গটিঞ্জেন, প্রভৃতির বিশ্ববিদ্যালয় এখানকার কনোজ, কাশী, কাঞ্চী, মথুরা প্রভৃতির চতুষ্পাঠীর সহিত তুলনায় প্রাথমিক পাঠশালার ন্যায় বোধ হয় বটে, কিন্তু এসকল হইলে কি হয়? এখানকার লোকেরা স্বাধীন নহে। ইহাঁদিগের রাজা যথেচ্ছাচারী। ইহাঁদিগের মধ্যে আমাদিগের মত পার্লিয়ামেণ্ট সভা নাই। বিশেষতঃ এখানকার খাদ্য সামগ্রী কিছুই ভাল নয়। ভারতবর্ষীয় খাদ্য ফলের মধ্যে একমাত্র নিচুই আমাদিগের স্বদেশীয় ফলের আস্বাদ ধারণ করে। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় স্ত্রী লোকেরা নিতান্তই সৌন্দর্য্য বিহীনা। উহাদিগের বর্ণ ধবল নহে, চুল রাঙ্গা কিম্বা কটা নহে, চক্ষুও কটা নহে, ললাট ফলক উচ্চ নহে। আর যদিও ইহারা একান্ত পতিপরায়ণা তথাপি সততই লজ্জাশীলা এবং বিনয়াবনতমুখী। ইহাদিগের এখনও প্রকৃত স্বাধীন ভাব জন্মে নাই। এখানকার বিধবারা প্রায়ই বিবাহ করে না। কোথাও কোথাও দুই একজন স্বামীর অনুমৃতাও হয়।

"পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা স্ত্রীলোকদিগকে গৃহের বাহিরে যাইতে দিত না। এক্ষণে তাহা অল্প পরিমাণে দিতে আরম্ভ করিয়াছে, অতএব বড় বড় ঘরওয়ানা অনেক স্ত্রীলোককে আমি দেখিতে পাইয়াছি। সে দিন

একজন প্রদেশাধিকারীর ভবনে একটী নাট্যাভিনয় হইয়াছিল, তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। ঐ প্রদেশাধিকারীর পিতা মুসলমান ছিলেন—ইনি কি হইয়াছেন জানিতে পারি নাই। মুসলমানেরা কখনই স্ত্রীলোকদিগকে ঘরের বাহিরে আনিত না। ইনি সস্ত্রীক হইয়া সভাস্থলে বসিয়াছিলেন। আরও অনেকে সপরিবার সভাস্থলে আসিয়াছিলেন। এইরূপ পরিবর্ত্তের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে একজন আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'দেখুন স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃই পুরুষদিগের অপেক্ষা দুর্ব্বলা অতএব পুরুষ কর্ত্তৃক অবশ্যই পরিরক্ষণীয়া হইবেন। যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন দেশের পুরুষেরাই আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়ে, তবে তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে গৃহ মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া আর কিরূপে রক্ষা করিবে; অতএব স্ত্রী নিরোধটী শুদ্ধ পরাধীনাবস্থার ফল। পরাধীনতা মোচন হইলেই স্ত্রী নিরোধও রহিত হইয়া যায়। হিন্দুরাও পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগকে গৃহপিঞ্জর নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতেন না। মুসলমানদিগের অধীন হইয়া পড়িলে তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে গৃহে বদ্ধ করেন। মুসলমানেরাও চিরকাল যথেচ্ছাচারী রাজার অধীন, এবং বিশেষতঃ বহু বিবাহ পরায়ণ, এই জন্য তাঁহারাও স্ত্রী নিরোধে বাধ্য ছিলেন। এখন ভারতবর্ষীয়েরা পরাধীন নহেন। এইজন্য স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বের ন্যায় নিরোধও নাই। যত দিন কোন দেশের শান্তিরক্ষা এবং ধর্ম্মাধিকরণের ভার কি বিজাতীয় কি যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিদিগের হস্তে থাকে, ততদিন সে দেশে স্ত্রীলোকদিগের সভারোহণ অথবা যথেচ্ছ বহির্গমন প্রচলিত হইতে পারে না। উল্লিখিত যুক্তি কতদূর যথার্থ, তাহার বিচার করিয়া কি ফল? পূর্ব্বে ইহারা বহু বিবাহ করিত, বোধ হয়, এখনও কতক করে, তবে অনেক কম হইয়া থাকিবে। এ বিষয়ে কোন রাজব্যবস্থা নাই।"

একজন মার্কিন মিসনরী তাঁহার কোন বন্ধুকে ভারতবর্ষ হইতে যে পত্র লিখেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে নিতান্ত হতাশ হইতে হইয়াছে। ইহাদিগের ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্রাহ্মণদিগের তুলনায় আমরা নিতান্ত অবিদ্য, অপবিত্র এবং অকর্ম্মণ্য লোক। ইহারা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রেও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন। সুতরাং উহাদিগের ধর্ম্মের কোন ভাগ অযৌক্তিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে গেলেই উহারা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে তাদৃশ অযৌক্তিকতা দেখাইয়া দেয়, এবং এই কথা বলে, যদি ভক্তি মূল করিয়া আপনাদিগের শাস্ত্রের অযৌক্তিক কথায় বিশ্বাস করা যায়, তবে আমাদিগের শাস্ত্রের আপাততঃ প্রতীয়মান অযৌক্তিকতা কিজন্য ভক্তি মূলে বিশ্বসিত না হইবে? এরূপ বিচারে জয় লাভের সম্ভাবনা নাই। বিচারে ত এইরূপ। কার্য্যে ইহাদিগের যত্ন, অধ্যবসায় এবং স্বার্থশূন্যতা জেসুটদিগের অপেক্ষাও অনেক অধিক। ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে যে সকল অসভ্য বন্যজাতীয় লোক থাকে, ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের মধ্যে গিয়া বাস করিতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে শান্ত, ত্যাগী এবং নম্র স্বভাব করিয়া তুলিতেছে। একটী উদাহরণ দিতেছি। ভারত সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্ত সীমায় আসাম নামে একটী প্রদেশ আছে। সেই প্রদেশে প্রকৃত ভারতবর্ষীয় ভিন্ন অপর কতকগুলি বন্য জাতীয় লোক বাস করে, তাহাদিগের নাম মিকি, আবর, গারো, নাগা, মিস্‌মি প্রভৃতি। আমি ঐ প্রদেশে গমন করিয়া দেখি, ঐ সকল জাতীয়দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া আছেন, এবং নিরন্তর অকৃত্রিম ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগের বিলক্ষণ প্রীতিভাজন হইতেছেন। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ঋষির কুটীরে অতিথি হইয়া তাঁহার কার্য্য দর্শন করিলাম। তন্মধ্যে বিশেষ বর্ণনীয় ব্যাপার এই।—তিনি আপন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বন্যদিগের গ্রাম মধ্যে গমন করেন, এবং উহাদিগের ক্ষেত্রাদির কর্ষণ কিরূপ হইয়াছে, স্বচক্ষে দেখিয়া যে ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দেন। অনন্তর যদি কাহারও কোন পীড়া হইয়া থাকে, তাহার চিকিৎসা করেন—পরে স্থূল স্থূল কথায় পরস্পরের মুখাপেক্ষিতা এবং পরিণাম দর্শিতার শিক্ষা দেন। কোন কোন বন্য ব্যক্তি প্রার্থনা করে, ঠাকুর আমাদিগকে মন্ত্র দান করিয়া উচ্চ জাতীয় করুন। এরূপ প্রার্থনা নিরন্তরই হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণ অমন সকল স্থলে জলসংস্কারাদি কোন বিধান দ্বারা কাহাকেও উচ্চ জাতীয় করেন না। তিনি বলেন যে, নীচ এবং অপকৃষ্টধর্ম্মক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ মনে করিলেই উচ্চজাতীয় হইতে পারে না—তপস্যা করিতে হয়। এই বলিয়া বিশেষ বিশেষ তপশ্চরণ করিবার আদেশ দেন। কাহাকেও বলেন, তুমি বৎসরাবধি এই এই দ্রব্য খাইও না—কাহাকেও বলেন, তুমি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিবে তাহার সিকি বা অর্দ্ধেক অন্যকে দান করিবে; কাহাকেও বলেন তুমি প্রত্যহ একজন অতিথির সেবা করিয়া তবে স্বয়ং অন্ন গ্রহণ করিবে। এইরূপ নানাবিধ উপায়ের দ্বারা ঐ সকল লোককে ইন্দ্রিয় সংযমন, লোভ সংবরণ, পরোক্ষদর্শন প্রভৃতি পুণ্য সম্পন্ন করা হয়। অনন্তর যে ব্যক্তি ঐ সকল আদেশ পালনপূর্ব্বক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহাকে মন্ত্র দান করিয়া বলা হয়,—"এক্ষণে তোমার ম্লেচ্ছত্ব গেল। তোমার দেয় পানীয় জলাদি আমার গ্রাহ্য হইল,

এবং তোমার প্রদত্ত সামগ্রীতেও দেব পূজা করা যাইতে পারে। এক্ষণ অবধি যদি ঐ মন্ত্রজপ সহকারে এক বৎসর এই এই নিয়ম পালন কর, তবে তোমাকে আরও উন্নত জাতির মধ্যে লওয়া যাইতে পারিবে।" ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানে এইরূপ করিয়া ছিলেন। সম্প্রতি প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতেও ঐ প্রণালীর অনুসারে কার্য্য করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুরের স্থানে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বন্যেরা সংস্কৃত হইয়া প্রথমে কোচ নাম প্রাপ্ত হয়, অনন্তর পুনঃ সংস্কৃত হইলে তাহারা কলিতা নাম ধারণ করে, তৎপরে পুনর্ব্বার সংস্কার লাভ করিলে সৎশূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। কখন ব্রাহ্মণ হইতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'প্রায়ই এক জন্মে পারে না, পরজন্মে পারে।' 'পর-জন্মে পারা আর না পারা তুল্য কথা, কাহার পরজন্ম কি হইল, তাহা ত কেহ জানিতে পারে না' এই কথা বলাতে ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'পুত্ররূপেই মনুষ্যের পর জন্ম হয়। অতি অন্ত্যজও ক্রমে ক্রমে সংস্কারপূত হইয়া সৎশূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। অনন্তর তাহার পুত্র তাদৃশ বিদ্যা, বুদ্ধি জ্ঞান সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণত্বেরও অধিকারী হয়। ভারতবর্ষীয়দিগের সংস্কার প্রণালী এইরূপ। আর একটী চমৎকারের বিষয় এই, ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছাতঃ এই দুরূহ ক্লেশকর কার্য্যে প্রবৃত্ত। কোথাও কোথাও ভূম্যধিকারীরাও তাঁহাদিগকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন। কিন্তু অধিক স্থলে ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং উদ্যোগী হইয়াই আপনাদিগের ধর্ম্ম বিস্তার করিতেছেন।"

নিশান্ধকার অপগত, পূর্ব্বাকাশ দীপ্যমান। আমি আর মর্ত্ত্য ভূমিতে অবস্থিতি করিতে পারি না। কিন্তু পাঠকের ভ্রম নিবারণার্থ সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়া যাই। কাল পুরুষ, সূর্য্য ও চন্দ্ররশ্মি দ্বারা পৃথিবী পৃষ্ঠে যে ইতিবৃত্ত লিখিয়া যান, তাঁহার অনুগামিনী স্মৃতি দেবী তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আবৃত্তি করিতে চেষ্টা করেন। আমি ঐ দেবীর ক্রীড়াসখী। ঐ ইতিবৃত্ত আবৃত্তি করিতে সখীর কষ্ট হইতেছে বুঝিতে পারিলেই পাঠ ভুলাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। সকল সময়ে পারি না, রাত্রিকালে স্বপ্নাবস্থায় প্রায়ই কৃতকার্য্য হই।

আমার নাম আশা। ঊষা আমার ভগিনী, আমি ঊষাসহ মিলিত হইতে চলিলাম।

সমাপ্ত।